শ্রীকাশীবিশ্বনাথ জী

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাস
প্রণীত।

— প্রকাশক —
শ্রীযুক্ত মাধপ্রসাদ বর্ম্মণ,
বুক সেলার,
পঞ্চমহল্লা, গয়া।

প্রথম সংস্করণ
সন ১৩৩৬ সাল।

মূল্য দশ আনা।

Printed by Gosto Behari Dey, at the Oriental Printing Works,
18, Brindabun Bysack Street, Calcutta.

সূচিপত্র।

কাশী, বারাণসী বা বেনারস।

কাশী অথবা রাজঘাট ষ্টেসান ই, আই, রেলওয়ের (E. I. Ry.) মোগলসরাই জংসন ষ্টেশন হইতে ৭ (সাত) মাইল দূরে গঙ্গার পশ্চিম কূলে অবস্থিত। কাশী ষ্টেশনের প্লাটফর্ম ডাফরিণ ব্রীজের মুখ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। কাশী ষ্টেশন হইতে আর চারি মাইল পশ্চিমে বেনারস কেণ্টোনমেণ্ট (Benares Cantonement) নামে একটী বড় ষ্টেশন আছে, এই ষ্টেশন হইতে অযোধ্যা যাইবার লাইন গিয়াছে। কাশী সহরের উত্তর দিকে বেনারস সিটী বা বেনারস সহর বলিয়া বী, এন্, ডব্লিউ, (B. N. W. Ry.) রেলের একটী ষ্টেশন আছে। উক্ত তিনটী প্রধান ষ্টেশন সহরের ভিতর বর্ত্তমান, এতৎভিন্ন ই, আই, রেলওয়ের (E. I. Ry.) ও বি, এন, ডব্লিউ রেলওয়ের (B. N. W. Ry.) অনেক গুলি ষ্টেশন (যাহা সহর হইতে দূরে) আছে; যথা সারনাথ, রাজাতলা ও মডুয়াডীহ ও শিবপুর ইত্যাদি। যে সময় গাড়ী মোগলসরাই হইতে ডাফরিণ ব্রীজের (Douffrin Bridge) উপর দিয়া কাশী ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হয় সেই সময় গাড়ীর উপর হইতে কাশীর অর্দ্ধচন্দ্রাকার দৃশ্য দেখিতে অতি মনোহর। ঘাটগুলির চিত্তাকর্ষক দৃশ্য, উন্নত অট্টালিকা শ্রেণীর ও নগরের শোভা দেখিলে মন পুলকিত হইতে থাকে। কাশীর ঘাট বিখ্যাত। বোগদাদ সহরে নদীর ধার যেমন সমস্ত সান বাঁধান, কাশীর ঘাটগুলিও ঠিক তদ্রূপ।

কাশী ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রধান ও পুরাতন সহর, ইহা সত্যযুগ হইতেই বর্ত্তমান। কাশী হিন্দুদের অতি পবিত্র তীর্থ এবং জাহ্নবীর বাম তটে অবস্থিত। শাস্ত্রমতে ভগবান মহাদেব প্রাণীদিগের মঙ্গলের জন্য, যাহারা এই পুণ্য ভূমিতে বসবাস করিবেন বা করিতেছেন এবং যাহারা মুক্ত হইবার মানসে নিজের দেহ এই পুণ্য ভূমিতে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের জন্য এই পঞ্চ ক্রোশী পুণ্যভূমি কাশী নিজের ত্রিশূলের উপর স্থাপিত করিয়াছেন। শাস্ত্রের মতে ৺কাশীধামে মৃত্যু হইলে দেবাদিদেব মহাদেবের আজ্ঞানুসারে জীব সংসারের গমনাগমন হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হয়। ইহা বেনারস বা কাশী দুই নামেতেই বিখ্যাত। বারাণসীর অপভ্রংশ বেনারস।

পুরাণে ইহার নাম কাশী, অভিমুক্ত ক্ষেত্র বা বারাণসী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই পুরীটী বরুণা ও অসীর মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহার নাম বারাণসী হইল। মোগল সাম্রাজ্যের সময় আউরঙ্গজেব যখন বিশ্বনাথের প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল সেই অবসরে

মন্দিরের পুরোহিত বা পাণ্ডা বিশ্বনাথকে জ্ঞান বাপীর কূপে নিক্ষেপ করিয়া ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মন্দির চিরস্মরনীয়া মহারাণী অহল্যাবাইয়ের নির্ম্মিত। পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ মন্দিরের সমস্ত উপরিভাগ আগা গোড়া সোনার পাত দিয়া মুড়িয়া দিয়াছেন। মন্দির প্রায় ৫১ ফিট উচ্চ। মন্দিরের ভিতরে একটী বিশাল ঘণ্টা ঝুলান আছে ; যাহার শব্দ প্রায় সমস্ত সহরে শোনা যায়। শ্রীবিশ্বনাথের সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, ও রাত্রির আরতী বিখ্যাত ও দেখিবার যোগ্য।

কাশীতে শ্রীবিশ্বনাথ ও শ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দির প্রসিদ্ধ। অর্দ্ধ বঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানী কাশীতে দুইটী উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছেন। প্রথমটী কাশীর সীমার নির্ণয় ও কাশী প্রদক্ষিণের জন্য পঞ্চ ক্রোশীর রাস্তার সংস্কার বা উদ্ধার। দ্বিতীয়টী শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর মন্দির স্থাপন। এই মন্দিরের চারি পার্শ্বে অনেক বাঁদর থাকে, সেই জন্য বিলাতী পথিকেরা ইহাকে Monkey Temple বলিয়া থাকে এই মন্দিরের ঠিক বাম পার্শ্বে একটী বৃহৎ চারি পাশ বাঁধান সুন্দর পুকুর আছে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় কাশীর সমস্ত দেবালয়ের বর্ণনা ও পরিচয় দেওয়া অতি কঠিন, তত্রাচ যথাসাধ্য দিতে চেষ্টা করা হইল।

কাশীর পরপারে ব্যাস কাশী। মহামুনি ব্যাস মহাদেবের উপর রুষ্ট হইয়া নিজ তপস্যার বলে এই স্থানে দ্বিতীয় কাশী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। মহাদেব তাঁহার কার্য্যে বিঘ্ন দিবার জন্য শ্রীঅন্নপূর্ণাকে স্মরণ করিলেন। অন্নপূর্ণা মহাদেবকে আশ্বাসিত করিয়া একটী বৃদ্ধার রূপ ধারণ করিয়া ব্যাসদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বারে বারে জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিতে লাগিলেন—"মহারাজ এখানে মরিলে কি হয় ?" ব্যাসদেব বারে বারে উত্তর দিয়া অবশেষে বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "বারে বারে কী জিজ্ঞাসা করিতেছ ! এখানে মরিলে গাধা হয়" যেমন এই কথা ব্যাসদেবের মুখ হইতে নিসৃত হইল অমনি অন্নপূর্ণা তথাস্তু বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন। সেই হইতেই প্রবাদ আছে যে এখানে মরিলে গাধা হয়। ব্যাসদেব এই স্থানে ব্যাসেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। এই স্থানে কাশীর রাজার বিশাল রাজভবন। ব্যাস কাশী অথবা রামনগরে একটী প্রসিদ্ধ দুর্গামন্দির আছে। কাশীরাজের গঙ্গামহলে ব্যাসদেবের একটী তৈলচিত্র (Oilpainting) ও ব্যাসেশ্বর শিবলিঙ্গও আছে।

পূর্ব্ব কাল হইতেই কাশী সংস্কৃত বিদ্যার একটী কেন্দ্রস্থান। কুইন্স কলেজ (Queens College) ইহা একটী সংস্কৃত কলেজ এবং অতি সুন্দর ভবন। ইহা নামী তত্বজ্ঞ মেজার কীটোর আদেশানুসারে ইংরাজী ১৮৫৮ সালে নির্ম্মাণ করা হয়। অনেকের ধারণা যে এমন অট্টালিকা এ প্রান্তে (provinec) নাই। হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের উৎসাহ এবং চেষ্টায় অতি সুন্দররূপে নির্ম্মাণ হইয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষে ইহার তুলনীয় কোন বিদ্যালয় নাই। ইহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা দেওয়ার

সুপ্রণালী করা হইয়াছে। বিস্তৃত ভূখণ্ডে যেন একটী জ্ঞানপুরী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ভারতের সমস্ত প্রান্ত হইতে ইহার সফলতা ও পুষ্টি সাধনের জন্য অনেকে অনেক দ্রব্য দিয়াছেন।

সারনাথ কাশীর একটী উপনগর ; ইহা কাশী হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা বৌদ্ধ-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ মৃগদাব। গৌতম বুদ্ধ নির্ব্বাণ মুক্তির উপায় অনুভব করিয়া এই স্থানে আসিয়া প্রথমে নিজের ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাই ইহা প্রচার ধর্ম্ম চক্রের প্রবর্ত্তক। সারনাথের সমস্ত ভবনাদি অনেক কাল হইতেই ভূমিগর্ভে প্রোথিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন সেই সকল আবিষ্কার হওয়াতে প্রাচীন কালের সংস্কার ও শিল্পের দেদীপ্যমান চিহ্ন সকল প্রত্যক্ষ হইয়া ভারতের শিল্প গৌরব বর্দ্ধিত করিতেছে। সেই সকল চিহ্নগুলি শিল্পাগারে (Musium) স্থাপিত করা হইয়াছে ও এখনও সযত্নে রক্ষা করা হইতেছে।

এই সকল চিহ্ন মধ্যে অতি উত্তম পালিস করা থাম (স্তম্ভ এবং তাহার মাথার উপরকার সিংহমুখ, ধ্যানী বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি, প্রস্তর নির্ম্মিত ছত্র, ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত মৃণ্ময় (মাটীর) পাত্র ও এবম্বিধ অনেক প্রকার প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি, ঐতিহাসিক তথা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রেম, শ্রদ্ধা ও মনোরঞ্জনের অনেক বস্তু রক্ষা করা হইয়াছে। যদ্দ্বারায় পৃথিবীর শিল্প বিনোদিরা স্তম্ভিত হইয়াছেন। এই স্থানে একটী স্তূপ আছে যাহার গগনস্পর্শী উচ্চ শিখর ভগবান বুদ্ধের প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার প্রেম ও অহিংসার সংবাদ সমস্ত ভূমণ্ডলে প্রচারিত করিতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক। ইহাতে কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় না থাকার দরুণ সাধারণ লোকের চিত্তাকর্ষক হইল না। এই কারণেই ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত হইল না। আচারে পরিপূর্ণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণ ইহা গ্রহণ করিল না।

স্মৃতি ও পুরাণে কাশী

কাশীতে পদার্পণ করিয়া যদি কেহ ইহাকে ত্যাগ করে তাহলে ভূতগণ হাততালি দিয়া হাসিতে থাকে।

কাশীতে দান করিলে মহৎ ফল হয়। সম্পূর্ণ মরুত, বসু, রুদ্র, সূর্য্য ও দেবতাগণ গ্রহণের সময় চন্দ্রমায় লীন হইয়া যান, অতএব গ্রহণে দান করা উচিত। চন্দ্র এবং সূর্য্যগ্রহণের দান অক্ষয় হয়।

কাশীতে তীর্থ করিতে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে শিব পূজা করা উচিত। কপিলকুণ্ডে স্নান করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল হয়। অবিমুক্তেশ্বর তীর্থ দর্শন করিলে মানুষ ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। এখানে মৃত্যু হইলে মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হয়।

পৃথিবীর সকল তীর্থের মধ্যে সপ্তপুরীই মহৎ, কিন্তু ঐ পুরীর ভিতর কাশীপুরী সর্ব্বোপরি। যখন কাশীতে যোগিনীদের কোন যুক্তি খাটিল না তখন মহাদেব মন্দার

পর্ব্বত হইতে সূর্য্যকে কাশীধামে প্রেরণ করিলেন। সূর্য্যও অনেক রূপ ধারণ করিলেন কিন্তু তাঁহার দ্বারাও কোন কার্য্য হইল না। তখন তিনি নিজেই নিম্নলিখিত দ্বাদশটী (১২) রূপ ধারণ করিয়া কাশীতে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

নাম—	ঠিকানা—
(১) লোলার্ক—	ভদৈনী পাড়ায় তুলসী ঘাটের নিকট কূপের ভিতর।
(২) উত্তরার্ক—	আলাইপুর পাড়া। যাহাকে এখানকার লোকে চলিত ভাষায় "বকরিয়া কুণ্ড" বলে।
(৩) সম্ব্যাদিত্য—	সূর্য্যকুণ্ড পাড়ায়।
(৪) দ্রুপদাদিত্য—	শ্রীবিশ্বনাথের মন্দিরের নিকট, হনুমানের মন্দিরের ভিতরে (নং ৭।৩১)।
(৫) ময়ুখাদিত্য—	মঙ্গলাগৌরী।
(৬) খখোলাদিত্য—	কামেশ্বরে, ত্রিলোচন বাজারের নিকট।
(৭) অরুণাদিত্য—	ত্রিলোচন মহাদেবের মন্দিরের ভিতর।
(৮) বৃদ্ধাদিত্য—	মীর ঘাট।
(৯) কেশবাদিত্য—	বরুণাসঙ্গমে আদিকেশবে।
(১০) বিমলাদিত্য—	জঙ্গমবাড়ী খারী কুঁয়ার নিকটে।
(১১) গঙ্গাদিত্য—	ললিতাঘাটে নেপালী খাপরা।
(১২) যমাদিত্য—	সঙ্কটা ঘাটের সিঁড়ীর উপরে।

রবিবার, ষষ্ঠী অথবা সপ্তমীযুক্ত রবিবারে উক্ত দ্বাদশ আদিত্যের যাত্রা করিলে সম্পূর্ণ রোগ হইতে মুক্ত হয় ও সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশ হয়। প্রলয়ের পরে যখন শিব সমস্ত সৃষ্টি নিজের মধ্যে লীন করিয়া একক রহিলেন, তখন তাঁহার কোন স্বরূপ বা বর্ণ ছিল না। তিনি সেই নির্গুণ ব্রহ্ম স্বগুণ রূপ হইবার মানসে পঞ্চ ভৌতিক শরীর ধারণ করিলেন এবং স্বগুণ রূপে "হর" নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তাঁহার "শম্ভু" "মহেশ" ইত্যাদি অনেক নাম হইল। সেই স্বগুণরূপ নিজ শরীর হইতে শক্তিকে উৎপাদন করিলেন এবং এক হইতে দুই হইলেন। সেই শিব আর শক্তি নিজ লীলার জন্য এই পাঁচ ক্রোশব্যাপী একটী ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিলেন, যাহা আনন্দ বন, কাশী, বারাণসী, অবিমুক্ত ক্ষেত্র, রুদ্রক্ষেত্র ও মহা শ্মশান ইত্যাদি অনেক নামে বিখ্যাত। শিবশক্তি এখানে অনেক কাল বিহার করিবার পর, শিব নিজের লিঙ্গ অবিমুক্ত অর্থাৎ বিশ্বনাথকে এখানে স্থাপিত করিলেন।

কাশীর প্রসিদ্ধ লিঙ্গ।

১ বিশ্বেশ্বর	৫ কৃত্তিবাসেশ্বর	৯ পর্ব্বতেশ্বর
২ কেশবেশ্বর	৬ বৃদ্ধকালেশ্বর	১০ পশুপতীশ্বর
৩ লোলার্কেশ্বর	৭ কালেশ্বর	১১ কেদারেশ্বর
৪ মহেশ্বর	৮ করেশ্বর	১২ কামেশ্বর

কাশীর প্রসিদ্ধ লিঙ্গ।

১৩ ত্রিলোচনেশ্বর
১৪ চণ্ডেশ্বর
১৫ গরুড়েশ্বর
১৬ গোকর্ণেশ্বর
১৭ নন্দিকেশ্বর
১৮ প্রীতিকেশ্বর
১৯ ভারভূতেশ্বর
২০ মণিকর্ণিকেশ্বর
২১ রত্নেশ্বর
২২ নর্ম্মদেশ্বর
২৩ লাঙ্গলেশ্বর
২৪ বরুণেশ্বর
২৫ শনৈঃশ্বরেশ্বর
২৬ সোমেশ্বর
২৭ বৃহস্পতীশ্বর
২৮ রবীশ্বর
২৯ সঙ্গমেশ্বর
৩০ হরীশ্বর
৩১ হরকেশেশ্বর
৩২ শৈলেশ্বর
৩৩ কুণ্ডেশ্বর
৩৪ যজ্ঞেশ্বর
৩৫ সুরেশ্বর
৩৬ শকেশ্বর
৩৭ মোক্ষেশ্বর
৩৮ রামেশ্বর
৩৯ তিলভাণ্ডেশ্বর
৪০ গুপ্তেশ্বর
৪১ মধ্যমেশ্বর
৪২ ভৌমেশ্বর
৪৩ বুধেশ্বর
৪৪ শুক্রেশ্বর
৪৫ তারকেশ্বর
৪৬ ধনেশ্বর
৪৭ ঋণেশ্বর বা ঋণ মুক্তেশ্বর
৪৮ ধ্রুবেশ্বর
৪৯ মহাদেবেশ্বর
৫০ তৃসধেশ্বর
৫১ কপৰ্দ্দীকেশ্বর
৫২ নীলেশ্বর
৫৩ সরেশ্বর
৫৪ ললিতেশ্বর
৫৫ ত্রিপুরেশ্বর
৫৬ হরেশ্বর
৫৭ বাণেশ্বর
৫৮ শ্রীশ্বর
৫৯ বামেশ্বর
৬০ বীরেশ্বর

কৃত্তিবাসেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, ওঁকারেশ্বর, কপৰ্দ্দীকেশ্বর এই পাঁচটী বারাণসীর গুহ্য লিঙ্গ।

ভক্তেরা ওঁকারে ও পঞ্চাক্ষরীতে ভেদ মানেন না কারণ ও'এতেই পাঁচটী অক্ষর আছে, কেবল স্বর ও ব্যঞ্জন মাত্র ভেদ। কাশীতে মৃত্যু হইলে সেই পঞ্চাক্ষরী (তারকব্রহ্ম) মন্ত্র শিব মৃতের কাণে দিয়া সেই মৃতকে মুক্ত করিয়া দেন। অবিমুক্ত ক্ষেত্র অর্থাৎ কাশীতে যে কোনও প্রকারে মৃত্যু হইলে মৃত নিঃসন্দেহে শিব সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, ইহা শিবের উক্তি। অবিমুক্তেশ্বরের অর্থাৎ বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গ দর্শন করিলে মনুষ্য পশুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

প্রতি মাসের অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ, বিষ্ণুতুলা শয়ন সংক্রান্তি, কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, এই সকল পর্ব্বে বিশেষ করিয়া এই ক্ষেত্রে বসবাস করা খুব উচিত কারণ বারাণসী ক্ষেত্রে উত্তর বাহিনী গঙ্গার কুলে কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, নৈমিষ, প্রয়াগ আদি অনেক তীর্থ পর্ব্ব দিনে আসিয়া বাস করেন। এই তীর্থ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে আড়াই যোজন লম্বা ও উত্তর হইতে দক্ষিণে দেড় যোজন বিস্তৃত।

চন্দ্রগ্রহণে বারাণসী ক্ষেত্রে স্নান করিলে মোক্ষ হয়।

অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বার) কাশী, কাঞ্চী (শিবকাঞ্চী তথা বিষ্ণুকাঞ্চী) অবন্তিকা (উজ্জয়িনী) ও দ্বারাবতী (দ্বারিকা) এই সপ্ত পুরী মোক্ষদায়িনী।

দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন যে আমার এই বারাণসীপুরী সমস্ত তীর্থ অপেক্ষা উত্তম। আমি কালরূপ ধরিয়া সমস্ত জগতের সংহার করি। চারি বর্ণের মনুষ্য বর্ণশঙ্কর, স্ত্রী, ম্লেচ্ছ, কীট, মৃগ, পক্ষী ইত্যাদি যাহার কাশীতে মৃত্যু হইবে সে বৃষভে চড়িয়া নিশ্চয় শিবপুরী যাইবে। কাশীতে মৃত্যু হইলে মৃত প্রাণীকে নরকে যাইতে হয় না। এই ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ, স্নান, জপ, হোম, দান, বাস ও মরণে মুক্তি হয়।

কাশীতে ৫৪ টী বিনায়ক আছেন, কিন্তু অষ্ট বিনায়কের যাত্রা প্রসিদ্ধ তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১ সিদ্ধিবিনায়ক—	মণিকর্ণিকাঘাট।
২ তৃসন্ধ্যাবিনায়ক—	লাহোরীটোলা। ভাঙ্গা গণেশের নামে প্রসিদ্ধ।
৩ আশাবিনায়ক—	মীরঘাট। হনুমান জিউর মন্দিরের ভিতরে।
৪ ক্ষিপ্রসাদবিনায়ক—	পিতৃকুণ্ড
৫ ঢুণ্ঢিরাজবিনায়ক—	এই নামেই পাড়ায় (বিশ্বনাথের গলির মোহানায়)
৬ অবিমুক্তবিনায়ক—	জ্ঞানব্যাপীতে।
৭ বক্রতুণ্ডবিনায়ক—	বড় গণেশ প্রসিদ্ধ।
৮ জ্ঞানবিনায়ক—	জ্ঞানবাপী।

প্রতিমাসের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে, রবি ও মঙ্গল বারে অষ্টমহাভৈরবের যাত্রা করিলে পাপের ক্ষয় হয় এবং ভৈরবী যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পায়। অষ্ট ভৈরব যথা :—

১ রুরুভৈরব—	হনুমান ঘাটে।
২ চণ্ডভৈরব—	দুর্গাদেবীর মন্দিরের ভিতর পশ্চিম ও দক্ষিণের কোণে।
৩ অসিতাঙ্গভৈরব—	বৃদ্ধকালে।
৪ কপালভৈরব—	লাট ভৈরবের নামে বিখ্যাত।
৫ ক্রোধভৈরব	কামাখ্যাদেবীর মন্দিরে।
৬ উন্মত্তভৈরব—	ডেঁডরা গ্রামে পঞ্চক্রোশীর রাস্তায়।
৭ সংহারভৈরব—	ত্রিলোচনে, পাটন দরজার নিকট।
৮ ভীষণভৈরব—	ভূত ভৈরবের নামে প্রসিদ্ধ।

অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও মঙ্গলবারে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার পূজা নিশ্চয় করা উচিত। নবরাত্রে নবদুর্গার যাত্রা এবং দুর্গা কুণ্ডে স্নান করিলে নবজন্মের পাপ হইতে অবশ্য মুক্ত হয়। নবদুর্গা যথা :—

১ শৈলপুত্রী—	মরিয়া ঘাট শৈলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে।
২ ব্রহ্মচারিণী—	দুর্গাঘাট।
৩ চিত্রঘটা—	লক্ষ্মী চৌতারা, চাঁদু নাপিতের গলি।
৪ কুষ্মাণ্ডাখ্যাদুর্গা—	দুর্গাবাড়ী, দুর্গাকুণ্ডের উপর।

৫ স্কন্দমাতা— বাগেশ্বরী দেবী, জৈতপুরার নিকটে।
৬ কাত্যায়নী— আত্মাধীরেশ্বর।
৭ কালরাত্রী— কালীমাতা, কালিকাগলি, অন্নপূর্ণার পিছনে।
৮ মহাগৌরী— সংকটা দেবী প্রসিদ্ধ।
৯ সিদ্ধিদাদুর্গা— সিদ্ধি মাতার গলি, বুশানালার নিকটে।

প্রতিমাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে নবগৌরীর যাত্রা করিলে সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়। নবগৌরী যথা :—

১ মুখনির্মিলিকা গৌরী— গয়াঘাট, হনুমানজিউর মন্দিরের ভিতর গোপ্রেক্ষা তীর্থ স্নান (গরুঘাটে)
২ জ্যেষ্ঠাগৌরী— ভূতভৈরবে। জ্যেষ্ঠা তীর্থে স্নান, ঐ স্থানে (লুপ্ত)
৩ সৌভাগ্যগৌরী— শ্রীকাশীবিশ্বনাথের মন্দিরের ভিতর উত্তর দক্ষিণে জ্ঞানবাপী তীর্থ স্নান প্রসিদ্ধ।
৪ শৃঙ্গারগৌরী— ঐ স্থানে দালানে।
৫ বিশালাক্ষিগৌরী— মীরঘাটে বিশাল তীর্থ স্নান (গঙ্গার সেই স্থানে)।
৬ ললিতাগৌরী— ললিতা ঘাটের উপর ললিতা তীর্থ স্নান (গঙ্গার ঐ স্থানে)।
৭ ভবানীগৌরী— অন্নপূর্ণা মাতাকেই বলে, পুরাতন স্নান কালিকা গলি।
৮ মঙ্গলাগৌরী— মঙ্গলাগৌরী প্রসিদ্ধ। পঞ্চগঙ্গা (বিন্দুতীর্থ) স্নান।
৯ মহালক্ষ্মীগৌরী— লক্ষ্মীকুণ্ড। লক্ষ্মীতীর্থে স্নান (লক্ষ্মীকুণ্ডে)।

নিত্য যাত্রা।

প্রথমে সচৈল চক্র পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া নিত্য যাত্রা আরম্ভ করিবে।

১ বিষ্ণু— বেণী মাধরের নামে প্রসিদ্ধ পঞ্চগঙ্গা ঘাটে।
২ দণ্ডপাণি— দণ্ডপাণির গলি কালভৈরবের নিকটে।
৩ মহেশ্বর— জ্ঞানবাপীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে।
৪ ঢুন্ঢিরাজ— বিশ্বনাথের পশ্চিমে এই নামে পাড়া প্রসিদ্ধ।
৫ জ্ঞানবাপী— বিশ্বনাথের মন্দিরের উত্তরে।
৬ নন্দিকেশ্বর— জ্ঞানবাপীর পূর্ব্বে।
৭ তারকেশ্বর— ঐ স্থানে।
৮ মহাকালেশ্বর— জ্ঞান বাপির দক্ষিণ পূর্ব্বের কোণে অশত্থ গাছের তলায়।
৯ পুনঃ দণ্ডপাণি— দণ্ডপাণির গলি কালভৈরবের নিকটে।
১০ বিশ্বেশ্বর— বিশ্বনাথের গলি।
১১ অন্নপূর্ণা— ঐ স্থানে।

বরুণা সঙ্গম—বরুণা একটী ছোট নদী পশ্চিম হইতে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ দিকে বাঁকিয়া পতিত পাবনী গঙ্গায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে, যাহার তটসঙ্গম হইতে কিছু পূর্ব্বে (অর্থাৎ বরুণার বাঁ ধারে) বশিষ্ঠেশ্বর ও কৃত্তীশ্বর শিব আছেন। এই ঘাট কাশীর আর পাঁচটী পবিত্র ঘাটের একটী। বরুণা সঙ্গমের নিকটে বিষ্ণু পাদোদক তীর্থ, শ্বেতদ্বীপ তীর্থ, ও বরুণেশ্বর আছেন। প্রতি ভাদ্রমাসে বরুণা সঙ্গমে স্নান ও দর্শনের জন্য যাত্রীর ভীড় হয় কিন্তু মহাবারুণীর সময় ভয়ানক ভীড় হইয়া থাকে।

মহাত্ম্য প্রমাণ

সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা বরুণা ও গঙ্গার সঙ্গম স্থলে "সঙ্গমেশ্বর" শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন। (লিং পুং)। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে কেশবাদিত্যের পূজা করিলে শত জন্মের পাপ বিনষ্ট হয় (স্কন্দ পুং)। ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশী, দ্বাদশী ও পূর্ণিমার দিন বরুণাসঙ্গমে স্নান করিলে পিশাচের জন্ম হয় না এবং পিণ্ড দান করিলে পিতৃ পুরুষগণ মুক্ত হইয়া যান (স্কন্দ পুরাণ)। ভাদ্র শুক্লা দ্বাদশীতে বিষ্ণু পাদোদক তীর্থে গিয়া বলিবামন জিউর ও আদিকেশব জিউর পূজা করা উচিত ভগবান শিব রাজা দেবদাসকে কাশী হইতে তাড়াইবার জন্য বিষ্ণুকে মন্দরাচল পর্ব্বত হইতে কাশীতে পাঠাইলেন। কাশীতে আসিয়া প্রথমে বিষ্ণু বরুণা ও গঙ্গার সঙ্গমে গিয়া হাত পা প্রক্ষালন করিয়া সচেল স্নান করিলেন, সেই দিন হইতে ঐ স্থান পাদোদক তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইল। বিষ্ণু ঐ স্থানে নিজের স্বরূপ পূজা করিলেন, সেই মূর্ত্তি আদিকেশবের নামে বিখ্যাত হইল। বিষ্ণু নিজে পূর্ণ স্বরূপ হইয়া কেশরীরূপ ধারণ করিয়া সেই থানেই স্থিত হইলেন এবং একটী ক্ষুদ্র অংশ লইয়া কাশীতে প্রবেশ করিলেন। গরুড় ও লক্ষ্মী ঐ স্থান হইতে উত্তরে কিছু দুরে গিয়া অবস্থান করিলেন। পাদোদক তীর্থ হইতে দক্ষিণে শঙ্খতীর্থ তথা হইতে আর একটু দক্ষিণে চক্রতীর্থ, গদাতীর্থ, পদ্মতীর্থ, গরুড়তীর্থ, নারদতীর্থ, প্রহ্লাদ তীর্থ ইত্যাদি অবস্থিত রহিয়াছে। (শিব পুং)।

ত্রিলোচন মন্দিরের নৈঋত কোণে একটি ছোট মন্দিরের ভিতর বারাণসী দেবী বিরাজ করিতেছেন, এই মন্দিরের পশ্চিম কুলুঙ্গিতে ৫৬ বিনায়কের একটী বিনায়ক "উদ্দন্ত বিনায়ক" আছেন। (শিব পুং)

কাশীর প্রধান দৃশ্য—(ঢুণ্ডিরাজ গণেশ, ইহাকে কাশীতে সর্ব্বাগ্রে পাঠান হয়, ইনিই কাশীর রক্ষক। বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইবার গলিতে ঢুক্‌তেই ইহার একটী ছোট মন্দির আছে, তাহার ভিতর ইনি বিরাজ করিতেছেন। প্রবাদ আছে যে ইহার পূজা সর্ব্বাগ্রে না করিলে যাত্রা সফল হয় না। **অন্নপূর্ণার মন্দির**—(মন্দিরের চারিধারে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে) অবিমুক্তেশ্বর শ্রীকাশীবিশ্বনাথ জিউর মন্দির, শিব-সভা (মন্দিরের ভিতরেতেই)
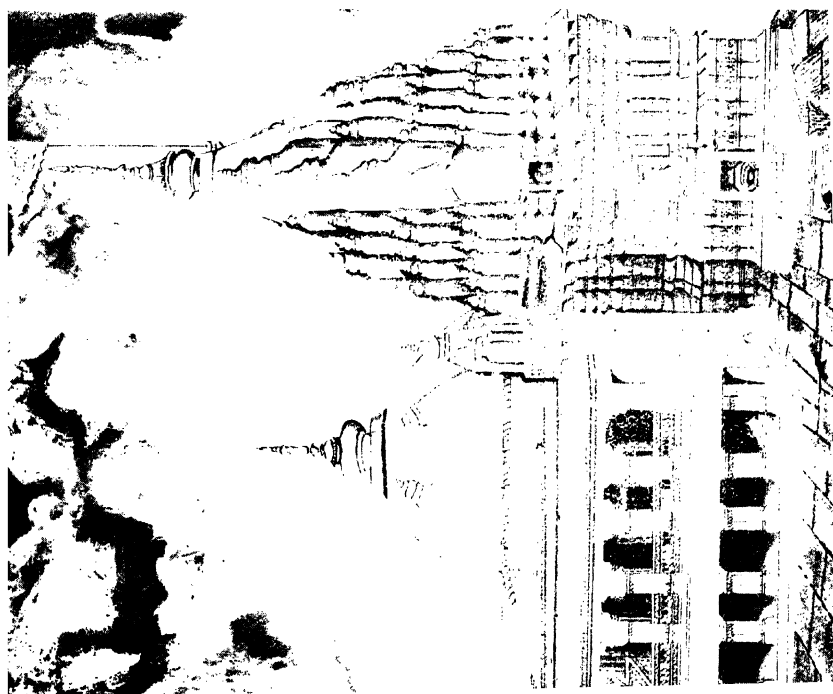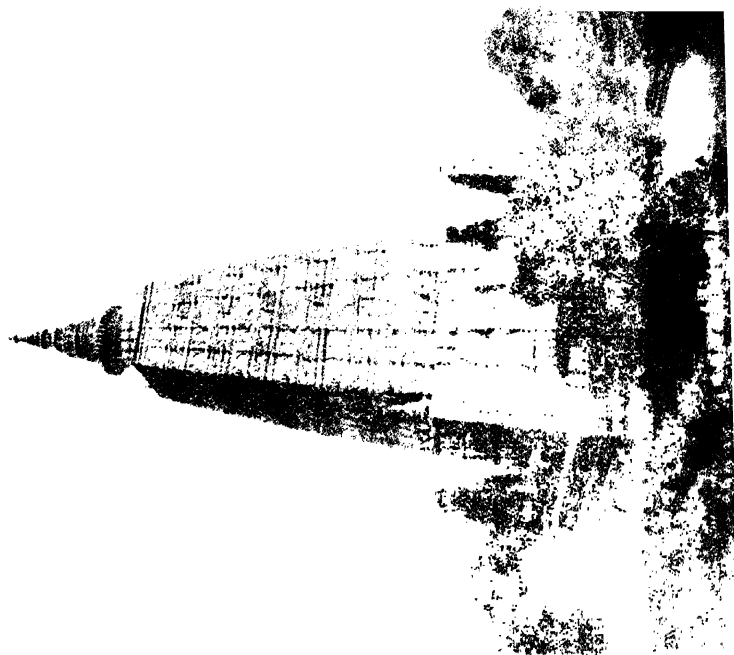
Chardham.

ाम्

चारधाम् ।
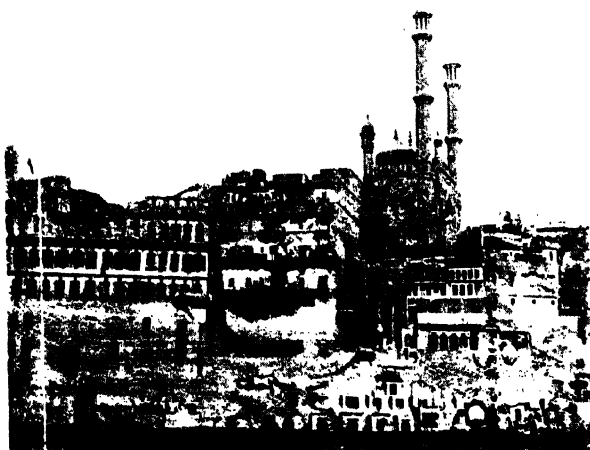
Benimadhab Ghat—Benares.

মাধব ঘাট—কাশী

বেণীমাধব ঘাট - কাশী

জ্ঞানবাপীর জ্ঞানকূপ—(রুদ্ররূপী ঈশান নিজ ত্রিশূল দ্বারায় এই কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন) হর পার্ব্বতী, হনুমান জিউর মন্দির—এই মন্দিরের ভিতর অক্ষয় বট, বিশ্বেশ্বরের পুরাতন মন্দির, ইহা মস্‌জিদ সংলগ্ন; তারকেশ্বর। কাশী করওয়াট, বিষ্ণুর চরণ পাদুকা; মণিকর্ণিকা (প্রবাদ আছে যখন মহাদেব সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ান এবং বিষ্ণু সেই সতীদেহ নিজ চক্র দ্বারা কাটিয়া ফেলেন, সেই সময়ে সতীর কর্ণের মণিকুণ্ডল কাটিয়া এই স্থানে পড়ে, সেই হইতেই ইহার নাম হইল মণিকর্ণিকা) চক্রতীর্থ; আত্মাধীরেশ্বর; সঙ্কটাদেবী; বিন্ধ্যাচলদেবী; বৃহস্পতি গুরু নাগেশ্বর, বেণীমাধব (এইস্থানে মুসলমানী ধ্বজা আছে, ইহাকে লোকে বেণীমাধবের ধ্বজা বলে; পঞ্চ গঙ্গা; তৈলঙ্গস্বামীর মূর্ত্তি; কালভৈরব (ব্রহ্মার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য মহাদেব নিজের শরীর হইতে কালভৈরবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কাশীতে ইনি কোটালের নামে বিখ্যাত, ইনি দুষ্টের দমন করেন) বৃদ্ধ-কালেশ্বর; দণ্ডপাণিভৈরব, বিষমভৈরব; ত্রিলোচন; বড়গণেশ; কাশীদেবী; মানমন্দির বিশালাক্ষি; দশাশ্বমেধ ঘাট (এখানে ব্রহ্মা দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন) শীতলামাতা; চৌষট্টীদেবী; কেদারেশ্বর; হরিশ্চন্দ্রঘাট; (রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা সর্ব্বসাধারণে অবগত আছেন; ইনি নিজের স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করিয়া সত্যধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন) মানেশ্বর; তিলভাণ্ডেশ্বর (ইনি প্রতিদিন তিল তিল বাড়েন) দুর্গাদেবীর মন্দির; চিন্তামণি গণেশ; ভাস্করানন্দ স্বামীর আশ্রম; হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়; অসীমাধব; বটুকভৈরব; কামাখ্যাদেবী; বৈদ্যনাথ; রামকৃষ্ণদেবাশ্রম; জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত মঠ; সূর্য্যকুণ্ড, লক্ষ্মীকুণ্ড; নাগকূপ; অমৃতকুণ্ড; পিশাচমোচন; কুইন্স কলেজ (Queens College) ভিক্টোরিয়া পার্ক; সঙ্কট মোচন (অতি উত্তম রমণীয় স্থান); অসীতে তুলসীদাসের স্থান; রামমন্দির (যে মন্দিরের জন্য গভর্ণমেণ্টের সহিত দাঙ্গা হইয়াছিল) জগন্নাথজিউর মন্দির; পঞ্চতীর্থ; **অসীসঙ্গম**; **বরুণাসঙ্গম**; **পঞ্চগঙ্গা**; **মণিকর্ণিকা**; **দশাশ্বমেধ**; এই পাঁচটী স্থানকে পঞ্চতীর্থ বলে। মানমন্দির ধন্বন্তরীকূপ (এখানকার জল খুব স্বাস্থ্যকর) ইত্যাদি।

গয়া

গয়া হিন্দুর পরম পবিত্র এবং প্রধান তীর্থ। (প্রাচীনকালে, দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত ইহাকে মগধ বলিত। সে সময় জরাসন্ধ রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন) এই স্থানে পিতৃপুরুষ-দের নামে পিণ্ড দান করা হয়। শৈলমালার শোভাই গয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য। রামশিলা, প্রেতশিলা, ব্রহ্মযোনি, ইত্যাদি পাহাড়ের দ্বারা ইহা বেষ্টিত। সমস্ত পর্ব্বতের শিখরেই দেব দেবীর মন্দির আছে। রামশিলা ৩৭২ ফিট উচ্চ। ইহার উপরে উঠিবার সিড়ী আছে। প্রেতশিলার উপরে জগৎ বিখ্যাত মহারাণী অহল্যাবাইয়ের নির্ম্মিত মন্দির আছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতের বিষয়ে লেখা আছে যে গৌতম বুদ্ধের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ ও চিরস্থায়ী রাখিবার জন্য সম্রাট অশোক ইহার শিখরের উপর একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ তাহার চিহ্নমাত্র নাই। ফল্গু নদী গয়া তীর্থের চরণ ধৌত করিয়া দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা একটী পাহাড়ী নদী বিশেষ; ইহাতে জলের পরিবর্ত্তে মরুভূমি সদৃশ কেবল বালুকা রেণু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার তটে বিস্তর দেব দেবীর মন্দির আছে তাহার ভিতর বিষ্ণুপাদ মন্দিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহারও নির্ম্মাণ কর্ত্তৃ সেই আমাদের বিশ্ববিখ্যাত পুণ্যময়ী মহারাণী অহল্যাবাই। বুকানন সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে উক্ত পুণ্যময়ী মহারাণী মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ৪৬ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৯ লক্ষ টাকা এই বিষ্ণুপাদ মন্দির প্রস্তুত করিতে খরচ করা হয়, আর বক্রী টাকা ব্রাহ্মণদের দান করা হয়। গয়ায় অনেক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে যাহার দ্বারায় ইহার প্রাচীনতা ও ঐতিহাসিকতা প্রমাণিত হইতেছে। ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ যে গয়ায় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মে খুব ঝগড়া হইয়াছিল।

রেল—গয়া ষ্টেশন ই, আই, রেলওয়ের গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনের একটী বড় জংসন। চতুর্দ্দিক হইতে এই স্থানে লাইন আসিয়াছে যথা মোগল সরাই, গোমা, আসানসোল, পাটনা এবং কিউল। মোগলসরাই ও পাটনা জংসন হইতে যাহারা এখানে আসেন তাহাদিগের বিশেষ সুবিধা। কারণ পাটনা ষ্টেশনের পরেই "পুনপুন" ষ্টেশন এবং মোগলসরাই জংসন হইতে আসিতে হইলে রাস্তায় শোন ইষ্ট ব্যাঙ্ক (Sone East bank) ষ্টেশন পড়ে এবং এই স্থানে "পুনপুন" নদী আছে। তাৎপর্য্য এই যে গয়ায় পিণ্ড দান করিতে হইলে **প্রথমে** "পুনপুন" নদীতে পিণ্ড দান করিতে হয়। উভয় স্থানেই থাকিবার জন্য রায় সূর্য্যমল বাহাদুরের ধর্ম্মশালা আছে। গয়া ষ্টেশন গয়া সহরের ভিতরে। ষ্টেশনের গায়ে অর্থাৎ ষ্টেশন ফটকের ঠিক সামনে রায় বাহাদুর সূর্য্যমল ঝুঝুনওয়ালার ধর্ম্মশালা; এই স্থানে যাত্রিদের থাকিবার খুব সুবিধা। ষ্টেশন হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে রায় বাহাদুর ঝুনঝুনওয়ালার আর একটী ধর্ম্মশালা আছে, ইহা "বড় ধর্ম্মশালা" নামে বিখ্যাত। ষ্টেশন হইতে বড় ধর্ম্মশালায় যাইবার গাড়ী ভাড়া ॥০ আট আনা মাত্র। গয়ালী পাণ্ডারাও যাত্রিদের নিজ বাসায় থাকিতে দেয়। ষ্টেশনে তাহাদের লোক পাণ্ডার নাম বলিয়া চিৎকার করিতে থাকে। **সাবধান** ইহা সর্ব্বসাধারণে বিদিত যে ধূর্ত্ত ও বদমাইস লোক সকল বড় তীর্থ স্থানেই আড্ডা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে এমন অনেক দুষ্ট লোক আছে যাহারা পাণ্ডার চাকর সাজিয়া যাত্রিদের লইয়া যায় এবং অন্য পাণ্ডা বা অন্য কোনও জাতির দ্বারায় পিণ্ড দান করাইয়া সুফল দিয়া থাকে। তাহাতে যাত্রিদের সকল গয়াকার্য্য পণ্ড হইয়া যায় অর্থাৎ নিষ্ফল হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্য—ইহার চারিদিকে বড় বড় পাহাড়। রামশিল পর্ব্বতের শিখর হইতে ইহার দৃশ্য অতি মনোহর। ইহার দক্ষিণদিক কিছু উচ্চ। নদী—অনেকগুলি। পুনপুন, ফল্গু, যমুনা, মোরহর ইত্যাদি সমস্ত নদিগুলিই দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত হইয়াছে।

গয়া জেলার দক্ষিণ সীমানা হইতে হাজারীবাগ জেলা আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানে একটী পাহাড় আছে, ইহাকে কৌলেশ্বরী পাহাড় বলে। ইহার শৃঙ্গে কৌলেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে। এই পর্ব্বতের উপর দ্বাপর যুগের অন্তে প্রায় ৪৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বিরাট রাজার নগর

ছিল। পুরাতন কেল্লার সীমার চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে কৌরবদের সহিত বিরাটের যুদ্ধ হইয়াছিল। পাণ্ডবেরা এই স্থানে ১২ বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন নিজ বাণের দ্বারায় একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডে অগাধ জল আছে।

বায়ুপুরাণ এবং অন্য ধর্ম্ম গল্পে লেখা আছে যে মৃত পিতৃ পুরুষের আত্মার উদ্ধার করিতে হইলে গয়ায় পিণ্ড দান করা অত্যাবশ্যক, পিণ্ড দান করিবার জন্য এখানে উপস্থিত ৪৫টী বেদী আছে। সর্ব্বোপরি বিষ্ণুপাদ। প্রাচীনকালে এখানে পিণ্ড দান করিতে হইলে একটী বৎসর লাগিত। প্রতিদিন একটী করিয়া ৩৬০ স্থানে পিণ্ড দিতে হইত। বর্ত্তমান সময়ে ৪৫টী বেদীতে পিণ্ড দিতে হয়। এই ৪৫টীর অতিরিক্ত আর সমস্ত বেদীই লোপ হইয়া গিয়াছে।

গয়াবেদীর পরিচয়

১ পুনপুন—পাদ পূজা
২ ফল্গু
৩ ব্রহ্ম কুণ্ড
৪ প্রেত শিলা
৫ রাম শিলা
৬ রাম কুণ্ড
৭ কাগবলী
৮ উত্তর মানস
৯ উদীচি
১০ কনখল
১১ দক্ষিণ মানস
১২ জিহ্বালোল
১৩ গদাধর জিউ
১৪ সরস্বতী
১৫ মাতঙ্গবাপী
১৬ ধর্ম্মারণ্য
১৭ বোধগয়া
১৮ ব্রহ্ম সরোবর
১৯ কাগবলী
২০ রুদ্র পদ
২১ বিষ্ণুপদ
২২ ব্রহ্মপদ
২৩ কার্ত্তিকপদ
২৪ দক্ষিণাগ্নি
২৫ গর্হ প্রত্যাগ্নি
২৬ আহং বনিয়াগ্নি
২৭ সূর্য্যপদ
২৮ চন্দ্রপদ
২৯ গণেশপদ
৩০ সম্যাগ্নিপদ
৩১ অবস্থাগ্নিপদ
৩২ দধিচীপদ
৩৩ কণ্বপদ
৩৪ মাতঙ্গপদ
৩৫ ক্রৈগঞ্চপদ
৩৬ ইন্দ্রপদ
৩৭ অগস্ত্যপদ
৩৮ কশ্যপপদ
৩৯ গজ করণ
৪০ রামগয়া
৪১ সীতাকুণ্ড
৪২ সৌভাগ্য দান
৪৩ গয়াশির
৪৪ গয়াকূপ
৪৫ কুণ্ড বৃষ্টা
৪৬ আদিগয়া
৪৭ ধৌত পদ
৪৮ ভীমগয়া
৪৯ গোপ্রচার
৫০ গদালোল
৫১ দুগ্ধ অর্পণ, দীপদান
৫২ বৈতরণী
৫৩ অক্ষয় বট
৫৪ গায়ত্রী ঘাট।

গয়া মহাত্ম্য

বায়ুপুরাণ—গয়াসুরের নাম হইতেই এই তীর্থের নাম "গয়া" হইয়াছে। গয়াসুরের পিতার নাম ত্রিপুরাসুর এবং তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা পতিব্রতা মাতার নাম প্রভাবতী ছিল। গয়াসুর অত্যন্ত বলবান ও দীর্ঘকায় ছিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট বেদ, বেদাঙ্গ ধর্ম্মশাস্ত্র, যুদ্ধ ও অস্ত্রবিদ্যাতে পারদর্শিতা লাভ করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার কঠোর তপস্যায় ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেন। যে কেহ ইঁহাকে স্পর্শ করিবে, সে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। কিছুকাল পরে মর্ত্ত্যলোক ও যমলোক একেবারে শূন্য হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মা বিচলিত হইয়া দেবতাদিগকে সঙ্গে লইয়া বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং সকল বৃত্তান্ত দুঃখের সহিত জানাইলেন। ভগবান বিষ্ণু সকল দেবতার স্তুতি শুনিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন আপনি গয়াসুরের পবিত্র বিশাল শরীরের উপর একটী যজ্ঞ অনুষ্ঠান করুন। ভগবান বিষ্ণুর আজ্ঞা পাইবামাত্র ব্রহ্মা গয়াসুরের নিকটে গিয়া যজ্ঞ কামনায় তাহার বিশাল শরীর এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন যে—তাহার পবিত্র শরীর ভিন্ন তাঁহাদের যজ্ঞ সমাধা হইতেছে না। পরম ধার্ম্মিক পরার্থপরায়ণ গয়াসুর ব্রহ্মার এবম্বিধ প্রার্থনায় নিজ শরীর যজ্ঞের জন্য প্রদান করিলেন। এবং ব্রহ্মাও তাঁহার পবিত্র শরীরের উপর যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। গয়াসুরকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা দেবতাদের পূর্ব্ব হইতেই ছিল, অতএব দেবতারা গয়াসুরের শরীরের উপর তাঁহাদের পূর্ণশক্তি ও বল লইয়া আবির্ভূত হইলেন, তথাপি চাপিয়া রাখিতে সমর্থ হইলেন না, যজ্ঞ আরম্ভ করিতেই গয়াসুরের শরীর নড়িতে লাগিল, তখন দেবতাগণ ও ব্রহ্মা সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার মস্তকের উপর ধর্ম্ম-শিলা স্থাপন করিলেন। (পুরাণে কথিত আছে মরীচি ঋষির পত্নী ধর্ম্মব্রতা অত্যন্ত পতিব্রতা স্ত্রী ছিলেন, এক দিবস তিনি পতির চরণ সেবা করিতেছিলেন ইত্যবসরে ঋষির পিতা স্বয়ং ব্রহ্মা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ধর্ম্মব্রতা পতির পদসেবা ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ শ্বশুরের সেবায় মনযোগ করিলেন। যখন মরীচি-ঋষির নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার পদ সেবা ছাড়িয়া দিয়াছে, তখন ক্রুদ্ধ হইয়া পত্নীকে শাপ দিলেন, "পাথর হইয়া যাও"। শাপ দিবা মাত্র ধর্ম্মব্রতা কাঁপিতে কাঁপিতে এবং ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে পাথর হইয়া গেলেন ; সেই শিলাই এই ধর্ম্ম-শিলা) এই শিলা গয়াসুরের মস্তকোপরি স্থাপিত হইবার পরও তাঁহার শরীর নড়িতে লাগিল। তখন সমস্ত দেবতারা পুনরায় ভগবান্ বিষ্ণুর নিকটে গিয়া ব্যাকুল হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু সেই সমস্ত দেবতার সহিত স্বয়ং গয়াসুরের শরীরের উপর ভর করিয়া গদাঘাতে তাঁহার শরীর নিঃস্পন্দ করিলেন। গয়াসুরের মৃত্যুর সময় ভগবান গয়াসুরকে বর চাহিতে বলিলেন, তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গয়াসুর বর চাহিলেন, "ভগবান্ যে স্থানে আমার মৃত্যু হইয়াছে সেই স্থানেই যেন আমি শিলা হইয়া থাকি। হে ভক্তবৎসল, সেই শিলার উপর যেন আপনার শ্রীচরণ স্থাপিত হয়। আর যে পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকা-মণ্ডল বিদ্যমান থাকিবে সেই পর্য্যন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমার এই শিলা-শরীরে অধিষ্ঠান করুন। আর যে কেহ

এই স্থানে পিণ্ডদান ও তর্পণ করিবে তাহার পিতৃপুরুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে বাস করিবে। যে দিন ইহার বিপরীত হইবে সেই দিন এই ক্ষেত্র এবং এই শিলার নাশ হইবে। প্রভো এই ক্ষেত্রের নাম গয়াক্ষেত্র হইবে।" তথাস্তু বলিয়া ভগবান বিষ্ণু নিজের পাদপদ্ম গয়াসুরের মস্তকে স্থাপন করিলেন। দেখিতে দেখিতে অসুরের শরীর শিলাতে পরিণত হইল।

বিষ্ণুপাদ মন্দির।

এই মন্দিরে যাইতে হইলে নয়াগড়ির ফটক হইতে হাঁটিয়া যাইতে হয়, ইহা ব্যতীত অন্য কোনও প্রশস্ত রাস্তা নাই। ঘোড়ার গাড়ী ও মটর গাড়ী শ্মশান ঘাট পর্য্যন্ত বড় রাস্তার উপরে যায়। এই বিষ্ণুপাদ মন্দিরের খুব নিকটে, (দক্ষিণদিকে) শ্রীবিষ্ণু ভগবানের মন্দির খ্যাতনামা ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাই সন ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিবার উপযুক্ত। এ জাতীয় পাথরের এত বড় মন্দির কোথাও নাই। এই মন্দিরের সভা-মন্দির খুব প্রশস্ত—বিচিত্রতা এই যে সকল সময়ই ইহা হইতে টপ টপ করিয়া জল পড়ে, প্রবাদ আছে যে, কোনও তীর্থের নাম উচ্চারণ করিয়া হাত বাড়াইলে দুই এক ফোঁটা জল হাতে নিশ্চয়ই পড়িবে। অগ্রে শ্রীবিষ্ণুর চরণ চিহ্নটী সুরক্ষিত করিয়া তাহার পর মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। চরণ চিহ্নটী দীর্ঘে ১৩ ইঞ্চি; ইহার আঙ্গুলগুলি উত্তরাভিমুখ। এই চিহ্নের চতুর্দ্দিকে এক ফুট উঁচু পাথরের আল্‌সে দেওয়া আছে। এই মন্দির ফল্গু ও মধুশ্রবা নদীরধারে অবস্থিত। পূর্ব্বদিকে সদর দরজার ঠিক সামনে শ্রীহনুমান জিউর একটী বিশাল মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের ঠিক উত্তর দিকে মহারাণী অহল্যাবাইয়ের নিজ মূর্ত্তি ও মন্দির।

সূর্য্যকুণ্ড—বিষ্ণুপাদ মন্দির হইতে উত্তর পশ্চিমে সূর্য্যকুণ্ড নামে একটী বিশাল পুষ্করিণী আছে। ইহার চারিধার পাথরের তৈরী উচু দেয়ালে ঘেরা, ইহার দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ মানস, মধ্যে কনখল এবং উত্তর ভাগে উরুচী-কুণ্ডের সামনে পশ্চিমদিকে সূর্য্যের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি আছে। এই স্থানে চৈত্র ও কার্ত্তিক মাসের শুক্লা অষ্টমীর দিন ও ষষ্ঠী-ব্রতে খুব মেলা হয়।

উত্তর মানস ও রামশিলা—সূর্য্যকুণ্ডের দক্ষিণ দিকের পথটী কৃষ্ণ দ্বারিকা হইয়া দক্ষিণ দরজার বাহিরে ব্রহ্ম সরোবরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। উত্তর মানসের রাস্তা সোজা চক হইয়া রামশিলা পাহাড়ের দিকে গিয়াছে। সূর্য্যকুণ্ড হইতে উত্তর মানস প্রায় এক মাইল। উত্তর মানস সরোবর সাহেরগঞ্জ শহরের নিকট। এখানেও পিণ্ড দান করা হয়।

উত্তর মানস হইতে রামশিলা—সাহেরগঞ্জ চক হইতে প্রায় ৩ ফার্লং সোজা উত্তরে যাইলে বড় রাস্তার উপর একটী ফটক দেখিতে পাওয়া যায়; এই স্থানটী দুঃখহরণ দেবীর নামে বিখ্যাত। এই ফটকেতেই দেবীর মূর্ত্তি বর্ত্তমান।

সীতাকুণ্ড—বিষ্ণুপাদ মন্দিরের ঠিক সামনে ফল্গুনদীর পর-পারে একটী মন্দিরের ভিতর কাল পাথরের একটী হাত আছে। প্রবাদ আছে যে, এই হাত অযোধ্যার রাজা শ্রীরামচন্দ্রের পিতা রাজা দশরথের। শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও জানকীর বন গমনের পর যখন রাজা দশরথের মৃত্যু হয়, সেই সময়ে মা জানকী এই স্থানে শ্বশুরের পিণ্ডদান করিয়াছিলেন এবং রাজা দশরথ হাত বাড়াইয়া পিণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফল্গু মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছিল বলিয়া জানকী তাহাকে "অন্তঃসলিলা হও" বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন। অক্ষয় বটকে তাহার সত্যবাদীতার জন্য অক্ষয় হইবার বর দিয়াছিলেন।

রামশিলা—দুঃখহরণী দেবী স্থান হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে রেলের পোলের নিম্ন দিয়া রাম-শিলা পর্য্যন্ত একটী রাস্তা গিয়াছে; রেলের পোল পার হইয়াই কাগবলী দেবীর মন্দির। এখানেও পিণ্ডদান করিতে হয়। বিষ্ণুপাদ মন্দির হইতে এই স্থান প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। রাম-শিলায় উঠিবার জন্য টিকারীর রাজা রণবাহাদুর সিংহ ৩৫৭টী সিঁড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। পাহাড়ের উপর পাতালেশ্বর শিব ও শ্রীরাম লক্ষ্মণের মন্দির আছে।

প্রেতশিলা—প্রেতশিলা পাহাড় রামশিলা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ অর্থাৎ ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। পাহাড়ের নীচে ব্রতকুণ্ড নামে একটী পুষ্করিণী আছে, ইহার চারি পাসের ঘাট বাঁধান। এস্থানে স্নান ও তর্পণ করিয়া পিণ্ডদান করিতে হয়। এই স্থানে পিণ্ডদান করিলে মৃত প্রেতযোনি হইতে উদ্ধার হইয়া যায়। এখানকার পাণ্ডাকে "ধামী" অর্থাৎ "প্রেতিয়া" বলে। প্রথম পিণ্ড প্রেত শিলায় দিতে হয়। তাহার পর রাম শিলায় পিণ্ডদান করিতে হয়। অপঘাত মৃত্যু হইলে প্রেত শিলায় পিণ্ড দেওয়া উচিত। এখানেও রায় সূর্য্যমল ঝুনঝুনওয়ালার একটী ছোট ধর্ম্মশালা আছে। পাহাড়ে উঠিতে হইলে ৪০০ সিঁড়ী উঠিতে হয়। পাহাড়ের উপরে মণ্ডপের নীচে পাথরের উপর তিনটী স্বর্ণ রেখা অঙ্কিত আছে, ইহাকে লোকে ব্রহ্মার লিপি বলিয়া থাকে।

অক্ষয় বট—শ্রীবিষ্ণুপাদ এবং ব্রহ্মযোনির মাঝামাঝি স্থানে অক্ষয় বট বিরাজমান। ইহার পশ্চিমে নিকটেই রুক্মিণী কুণ্ড (পুষ্করিণী) এই জায়গায় শেষ পিণ্ডদান করিতে হয় এবং এই স্থানেই বট বৃক্ষের তলায় পাণ্ডারা যাত্রীদের (যাহারা পিণ্ডদান ও গয়াশ্রাদ্ধ করিতে আসিয়াছেন) সফল দেয় অর্থাৎ বলে যে "তোমার গয়াকার্য্য সফল হইল"। প্রবাদ আছে যে এই বৃক্ষ ত্রেতা যুগ হইতে এই স্থানেই বর্ত্তমান আছে।

মঙ্গলা গৌরী—অক্ষয় বট হইতে কিছু পূর্ব্বে আদি মায়া মঙ্গলা গৌরীর মন্দির। প্রায় ১২৫টী সিঁড়ী উপরে উঠিবার পর আদি মায়া মঙ্গলা গৌরী (স্তূপ) দর্শন হয়। অনুষ্ঠান ও পাঠাদি করিবার জন্য এই মন্দিরের সংলগ্ন একটী মণ্ডপ অর্থাৎ দালান আছে। এই মন্দিরের উত্তর দিকে জনার্দ্দন ভগবানের মন্দির।

○ **ব্রহ্মযোনি**—ব্রহ্মযোনি পাহাড় বিষ্ণুপাদ হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে। ইহার উপর উঠিতে হইলে ৪২৫টী সিঁড়ী উঠিতে হয়, এই সিঁড়ীগুলি ইন্দোরে মহারাজা তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছেন। পাহাড়ের উপর দুইটী সংকীর্ণ গুহা আছে, ইহা মাতৃযোনি নামে

প্রসিদ্ধ। জন শ্রুতি এই যে—এই দুইটী গুহার মধ্য হইতে পার হইয়া গেলে মনুষ্য এই ভবে গমনাগমন (জন্ম মৃত্যু) হইতে মুক্ত হইয়া যায়। প্রবাদ আছে—যে বর্ণশঙ্কর হইবে সে এই গুহা পার হইয়া যাইতে পারে না।

বুদ্ধগয়া—গয়ার একটী উপনগরকে বুদ্ধগয়া বলে। এই স্থান গয়া হইতে ৭ মাইল দূরে নিরঞ্জনা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম উরুবিম্ব ছিল। বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবের স্মৃতির জন্য নিম্নলিখিত এই চারিটী স্থান পবিত্র বলিয়া মানে (১) কপিলাবস্তু বুদ্ধদেবের জন্মস্থান (২) উরুবিম্ব যেখানে বুদ্ধদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, (৩) বারাণসী যে স্থান হইতে বুদ্ধদেব নিজের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং (৪) কুশীনগর যেখানে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব মুক্ত হইবার মানসে রাজ্য, রাজভবন এবং আত্ম পরিজন, কুটুম্ব, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীদের মধ্যে জ্ঞানোপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের তৃষ্ণা কোথাও তৃপ্ত না হওয়ায় অবশেষে বুদ্ধ গয়ায় উপস্থিত হইলেন। এখানে উপস্থিত হইয়া উরুবিম্ব গ্রামে ষড়-বার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহাতেও তাঁহার শান্তিলাভ হইল না; তখন তিনি নিরঞ্জনা নদীর জলে স্নান করিয়া দেহের ক্লান্তি দূর করিলেন এবং সুজাতা নাম্নী একটী কন্যার হাতে অন্ন ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলেন। তাহার পর বোধী বৃক্ষমূলে প্রাণ ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। সেই কারণে উরুবিম্ব গ্রামকে বুধগয়া (বুদ্ধগয়া) বলে। বুধগয়ার মন্দির ভূগর্ভে প্রোথিত ছিল, কেবল কলস (মাথার চূড়া) বাহিরে দেখিতে পাওয়া যাইত। ১৮৮১ সালে গবর্ণমেণ্টের (Government's) সহায়তা ও অনুগ্রহে ইহার উদ্ধার সাধন করা হইয়াছে। এই মন্দিরটী ১৭০ ফিট উচ্চ, মন্দিরের পশ্চিমে একটী অশ্বত্থ গাছ আছে, ইহাকে লোকে সত্যযুগের একটী গাছের শাখা বলিয়া প্রবাদ দেয়। এই স্থানে শাক্যমুনি (বুদ্ধদেব) ৩৬ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন এবং নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বৃক্ষের সন্নিকটে বজ্রাসনা দেবীর মূর্ত্তি আছে। এই বৃক্ষের দক্ষিণ দিকে হিন্দুগণ পিতৃ-পুরুষের পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। এই স্থানে আজও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। শাক্যমুনির (বুদ্ধদেবের) বিশাল প্রস্তর মূর্ত্তি পূর্ব্বার্দ্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। মূর্ত্তির গায়ে সোনার পাত দেওয়া আছে। ২৩০০ বৎসরের অধিককাল এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। বৌদ্ধেরা সচরাচর এখানে বেড়াইতে আসিয়া থাকেন। মন্দিরের দক্ষিণে একটী পুষ্করিণী আছে, এই পুষ্করিণীটাকে লোকে বুদ্ধ কুণ্ড বলে। শাক্যমুনি কখনও কখনও এই কুণ্ডে স্নান করিতেন। এই মন্দিরের প্রায় ১৫০ হাত দূরে কোনও রাণীর নির্ম্মিত একটী জগন্নাথের মন্দির আছে। উক্ত মন্দিরের সমস্ত খরচ সেই রাণীই দিয়া থাকেন। বুদ্ধগয়ার মহন্ত মহারাজ অতি সজ্জন এবং সরল প্রকৃতির লোক। মহন্তের গদি শ্রীমদ্‌জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত, কারণ যখন তিনি বৌদ্ধ-গণকে ধর্ম্মবিচারে পরাজয় করিলেন সেই সময়ে এই গদীর স্থাপনা করেন। যে কেহ ইচ্ছা করিলেই মহন্ত জীউর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে। বুদ্ধ দেবের মন্দিরও মহন্ত জীউর অধীনে। সনাতন-ধর্ম্ম অনুসারে এখানেও পিণ্ডদান করা হয়। মন্দিরের নিকটে বুদ্ধগয়া বলিয়া

একটী ছোট গ্রাম আছে, এখানে খাবার জিনিস, দুধ, ঘি, ইত্যাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। মহন্ত জিউর তরফ হইতে সদাব্রত দেওয়া হয়। এখানে সরকারী পুলিস, থানা ও পোষ্ট আপিস আছে।

গয়া ষ্টেশন অথবা ধর্ম্মশালা হইতে বুদ্ধগয়া যাইবার জন্য গাড়ী, টাঙ্গা ইত্যাদি পাওয়া যায়। যাওয়া আসার ভাড়া ৩॥০ টাকা হইতে অধিকন্তু ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত। কিন্তু পিতৃপক্ষের দিনে কিছু অধিক দিতে হয়।

রাজগিরি।

বিহার প্রান্ত হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে, কিছু পশ্চিমে এবং বখতিয়ারপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ৩২ মাইল দক্ষিণে পাটনা জেলার অন্তর্গত রাজগৃহ তীর্থ। বিহার লাইট রেলওয়ে বখতিয়ারপুর হইতে রাজগৃহ কুণ্ড ষ্টেশন পর্য্যন্ত যায়।

মহুয়াবাগ হইতে পশ্চিমে দুই মাইল রাস্তা বড় গাঁর দিকে গিয়াছে, ইহাকে ঐ স্থানের লোকেরা কুন্তিনপুর বলে। এই স্থানে রুক্মিণীর পিতা ভিষ্মকের রাজধানী ছিল। পুরাণের দ্বারায় প্রমাণিত হইতেছে যে বিদর্ভ দেশে কুন্তিনপুর নামে একটী নগর ছিল। (কিন্তু বিদর্ভ দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন মহারাজ ভীষ্মক)।

রাজগৃহ হইতে ৮ মাইল দূরে বড়গ্রাম জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। এই স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির আছে। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে এখানে বৌদ্ধ যাত্রীরা আসা যাওয়া করে। রাজগৃহে সরস্বতী নদী আছে। এই নদীটী বৈভার পর্ব্বতের পূর্ব্বোত্তর ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্ব্ব হইতে আসিয়া উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটে সরস্বতীকে প্রাচী সরস্বতী বলে। যাত্রিদের প্রথমে এই স্থানে স্নান করিতে হয়। সরস্বতী কুণ্ড হইতে পশ্চিমে বৈভার পর্ব্বতের পূর্ব্বোত্তর গ্রামের নিকট মার্কণ্ডেয় ক্ষেত্র। সরস্বতী কুণ্ড হইতে ক্ষেত্র পর্য্যন্ত পাকা সিঁড়ী আছে। এই স্থানে সাতটী কুণ্ড আছে, ইহার মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড সর্ব্বপ্রধান। (১) মার্কণ্ডেয় কুণ্ড (২) ব্যাসকুণ্ড (৩) গঙ্গাযমুনা কুণ্ড (৪) অনন্তনারায়ণ কুণ্ড (৫) সপ্তর্ষিধারা (৬) কাশীধারা (৭) ব্রহ্মকুণ্ড তৃতীয় কুণ্ডের ভিতর (গঙ্গা যমুনা কুণ্ডে) ইহার একটী ধারায় গরম জল এবং দ্বিতীয় ধারায় ঠাণ্ডা জল। আর সকল কুণ্ডের জলই গরম (অনন্তনারায়ণ কুণ্ডের নাম রাজগৃহ মাহাত্ম্যে উল্লেখ নাই) সপ্তর্ষি ধারার উত্তর দক্ষিণে একটী বাওলী আছে এবং উহার পশ্চিম দিকে ৫টী ও দক্ষিণ দিকে দুইটী ঝরণা আছে। এই সাতটী ঝরণায় স্নান করিতে হয়; ইহা সপ্তর্ষির নামে প্রসিদ্ধ। (১) অত্রী (২) ভরদ্বাজ (৩) কশ্যপ (৪) গৌতম (৫) বিশ্বামিত্র (৬) বশিষ্ঠ (৭) যমদগ্নি। কিন্তু রাজগৃহ মাহাত্ম্যে অত্রী ও কশ্যপের পরিবর্ত্তে দুর্ব্বাসা ও পরাশর তীর্থ লেখা আছে। বাওলীর পশ্চিম দেওয়ালে একটী শিলালিপি আছে; ইহা পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে সম্বৎ ১৯০৪এ এই স্থান হইতে দশ ক্রোশ অন্তরে (পূর্ব্বে) একটী লোক ইহার নির্ম্মাণ করিয়াছে। বাওলীর দক্ষিণ ধারে কোন কায়স্থের নির্ম্মিত

সপ্ত ঋষির সাতটী পৃথক পৃথক মন্দির আছে। এই মন্দিরের নিকটেই ব্রহ্মকুণ্ড। রাজগৃহের সমস্ত কুণ্ড অপেক্ষা এই কুণ্ডের জল অধিক গরম। এই কুণ্ডে জলের ধারে ব্রহ্মা, লক্ষ্মী ও গণেশের মূর্ত্তি আছে। দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের ঢালের উপর সন্ধ্যাদেবীর একটী ছোট মন্দির আছে। ইহার নিকটেই কেদার কুণ্ড। পুত্রকামনা করিয়া স্ত্রীলোকেরা এই কুণ্ডে স্নান করেন। এই কুণ্ডের পশ্চিম দিকে বিষ্ণুর চরণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সরস্বতী কুণ্ড হইতে প্রায় ২০০ গজ দূরে আরও পাঁচটী কুণ্ড আছে। যথা :—

১ সীতাকুণ্ড— ইহার উত্তরে "হাটকেশ্বর" মহাদেবের মন্দির আছে।
২ সূর্য্যকুণ্ড— হাটকেশ্বর হইতে উত্তরে।
৩ চন্দ্রকুণ্ড— ঐ—
৪ গণেশকুণ্ড— ঐ—
৫ রামকুণ্ড— ঐ—

উক্ত সমস্ত কুণ্ড হইতে গরম জলের ঝরণা পড়ে। রামকুণ্ডের একটী ঝরণার জল গরম, অন্যটীর জল ঠাণ্ডা। রাজগৃহ-মাহাত্ম্যে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। বিপুলাচল পর্ব্বতের গোড়ার শৃঙ্গে একটী কুণ্ড আছে। এই স্থানে কোনও সময়ে মখদুম সাহেব বলিয়া একটী মুসলমান সিদ্ধ পুরুষ থাকিতেন। সেই জন্য এই স্থানটী মুসলমানদের অধীনে আছে। মুসলমানেরা ইহাকে 'মখদুম কুণ্ড' বলিয়া থাকে। সরস্বতী কুণ্ড হইতে প্রায় দেড় মাইল উত্তরে, এই সরস্বতীকে বৈতরণী বলে। এই স্থানে গো দান এবং পিণ্ড দানও করা হয়। সঙ্কল্পের জন্য এই স্থানে এক আনায় একটী বাছুর কিনিতে পাওয়া যায়। গোয়ালারা সঙ্কল্প করাইয়া বাছুর ফেরত লয়। এই স্থান হইতে চারি শত গজ দূরে (উত্তরে) এই সরস্বতীকে শালগ্রাম কুণ্ড বলে। ইহার পূর্ব্ব দিকে একটী ছোট মন্দিরের ভিতর ধর্ম্মেশ্বর মহাদেব আছেন ; ইহার পূর্ব্বে ভরত কূপ, অনেক গুলি সিঁড়ি ভিতরে নামিয়া তবে স্নান করিতে হয়। এই কূপের নাম রাজগৃহ-মাহাত্ম্যে উল্লেখ নাই। সরস্বতী কুণ্ড হইতে দক্ষিণে বানরী কুণ্ড বলিয়া একটী ছোট কুণ্ড আছে, ইহার জল লোকে কেবলমাত্র স্পর্শ করে। এই স্থানটীকে লোকে বানরীতরণ ক্ষেত্র বলে। এখান হইতে কিছু দূর দক্ষিণে গোদাবরী নামে একটী ছোট স্রোতধারা সরস্বতীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থল হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বে পাহাড়ের উপর জ্বালাদেবীর একটী ছোট মন্দির আছে।

বৈভার পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে ১১×৫১ গজ আয়তনে সোমভাণ্ডার নামে একটী গুহা আছে। এই গুহার পূর্ব্ব ভাগে বুদ্ধদেবের একটী চতুর্ম্মুখ মূর্ত্তি আছে। বৌদ্ধগণ সোমভাণ্ডারকে অতি পবিত্র স্থান বলিয়া পূজা করে। এই স্থানে ৫৪৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের সম্মুখে তাঁহার প্রায় ৫০০ শত শিষ্য সমবেত হইয়া ধর্ম্মসভা করিয়াছিল, ইহাই বৌদ্ধদিগের প্রথম ধর্ম্মসভা।

রাজগৃহের পাহাড় প্রায় এক হাজার ফিট উচ্চ। এখানে শিলাজতু পাওয়া যায়। বৈভার, বিপুলাচল (মহাভারতের চৈতক) রত্নগিরি (মহাভারতের ঋষিগিরি) উদয় গিরি ও সোম-

গিরি এই পাঁচটী প্রধান পাহাড়। বৈভার পর্ব্বতের উপর একটী পুরাতন মন্দির আছে, তথায় সোমনাথ ও সিদ্ধনাথ নামে দুইটী শিবলিঙ্গ আছেন। ইহার সন্নিকটে ৬ ছয়টী জৈন মন্দির আছে। মলমাসে হিন্দু যাত্রিগণ দর্শনের জন্য এখানে আসে। এবং জৈন মন্দির গুলিকে হিন্দু মন্দির মনে করিয়া পূজা দিয়া থাকে। সেখানকার চাকরেরা যাত্রীদের হিন্দু মন্দির বলিয়া শঠতা করিয়া পয়সা লুণ্ঠন করে। মহাভারতে উক্ত আছে যে এই পাঁচটী পাহাড়ের মধ্যে জরাসন্ধের গিরিব্রজনামে রাজধানী ছিল।

রাজগৃহের চতুর্দ্দিক (প্রায় চারি মাইল ব্যবধানে) প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল, এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। বাণগঙ্গার উত্তরে অনেক গুলি শিলালিপি আছে। ইহা অদ্যাবধি কেহ পড়িতে পারে নাই। রঙ্গভূমিও এই স্থানে অবস্থিত। লোক প্রবাদ আছে যে এই স্থানে ভীমসেন জরাসন্ধকে নিহত করিয়াছিলেন।

৫৮ কুণ্ডের নাম।

১ সরস্বতী কুণ্ড
২ গোদাবরী তীর্থ
৩ সরস্বতী সঙ্গম
৪ মার্কণ্ডেয় ক্ষেত্র
৫ উত্তরবাহিনী গঙ্গা
৬ বিভামণ্ডক শিব
৭ সরস্বতী তীর্থ
৮ মাধব তীর্থ
৯ শালগ্রাম তীর্থ
১০ শিলাতীর্থ
১১ পঞ্চলিঙ্গ শিব
১২ কুম্ভ প্রদর্শন শিব
১৩ কপর্দ্দক শিব
১৪ ব্রতমোক্ষণ কুণ্ড
১৫ ধর্ম্মেশ্বর শিব
১৬ মহাভবানী কুণ্ড
১৭ ব্রহ্ম কুণ্ড
১৮ পাতাল গঙ্গা
১৯ হংসতীর্থ কুণ্ড
২০ ভক্ষণ কুণ্ড
২১ বরাহ ভগবান
২২ বারিধারা কুণ্ড
২৩ গঙ্গাতীর্থ
২৪ যমুনাতীর্থ
২৫ নর্ম্মদা তীর্থ
২৬ মার্কণ্ডেয় তীর্থ
২৭ গৌতম কুণ্ড
২৮ যমদগ্নি কুণ্ড
২৯ ভরদ্বাজ কুণ্ড
৩০ দুর্ব্বাসা কুণ্ড
৩১ বশিষ্ঠ কুণ্ড
৩২ পরাশর কুণ্ড
৩৩ বিশ্বামিত্র কুণ্ড
৩৪ কামাখ্যা কুণ্ড
৩৫ গণপতি কুণ্ড
৩৬ চন্দ্রমা কুণ্ড
৩৬ সূর্য্য কুণ্ড
৩৮ সীতাকুণ্ড
৩৯ রত্নাবলপাহাড় হাটকেশ্বর
৪০ ঋষ্যশৃঙ্গ পাহাড়
৪১ রত্নাবল পাহাড়ের উপর তিনটী ধারা
৪২ ব্রহ্মধারা
৪৩ বিষ্ণুধারা
৪৪ শিবধারা
৪৫ নাম মতী
৪৬ গৌতম কুণ্ড
৪৭ অহল্যাকুণ্ড
৪৮ দ্রৌপদী কুণ্ড
৪৯ কুন্তী কুণ্ড
৫০ তারা কুণ্ড
৫১ মন্দোদরী কুণ্ড
৫২ ব্যাস কুণ্ড
৫৩ ধীত কুণ্ড
৫৪ অগ্নি কুণ্ড
৫৫ বাণ কুণ্ড
৫৬ অশ্বিনী কুমার
৫৭ কৌশিকমুনি কুণ্ড
৫৮ জরাসন্ধ ধাম।

পাটনা (পাটলীপুত্র) বাঁকীপুর।

পাটনা ও বাঁকীপুর এই দুইটী ষ্টেশন্ একত্রে মিলিত হইয়া পাটনা জংসন (Patna Junction) ষ্টেশন্ হইয়াছে।

পাটনা হাওড়া ষ্টেশন্ (Howrah Station) হইতে ৩৩৮ মাইল পশ্চিমে। সিমুলতলা বৈদ্যনাথ আদি ষ্টেশন্ পার হইয়া পাটনা জংসন একটী বড় ষ্টেশন্। পাটনা একটী পুরাতন সহর। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ইহার মহত্ত্বের স্মৃতি আছে। এখানে দুইটী ধর্ম্মশালা আছে; একটি রেলওয়ে ষ্টেশন্ হইতে একটু পশ্চিমে ও অন্যটী চকের নিকটে। পাটনায় চারিটী প্রধান দেবালয় আছে। (১) গোপীনাথ, (২) বড় পাটন দেবী, (৩) ছোট পাটন দেবী, (৪) হরিমন্দির। গুলজার বাগ হইতে রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের সামনে একটী সমাধি স্থান আছে, যে স্থানে মীরকাশিমের সময় মৃত লোকের সমাধি দেওয়া হইত।

বাঁকীপুরে ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অহিফেনের (আপিন) কুঠী ছিল। এখানে মেডিকেল কলেজ; বিহার ন্যাশানাল কলেজ; দাতব্য চিকিৎসালয়; পাব্লিক্ লাইব্রেরী ইত্যাদি দেখিবার উপযুক্ত। সিভিল কাচারি (Civil Court) ও আপিন কুঠীর মধ্যে প্রতিবর্ষে শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবারে খুব বড় মেলা হয় এবং মহাদেবের মন্দিরে উৎসব হইয়া থাকে। ১৭৮৪ সালে ধান্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য একটী প্রকাণ্ড মণ্ডপ প্রস্তুত করা হইয়াছিল, ইহা একটী দেখিবার জিনিষ। উক্ত মণ্ডপ অকালে ধন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহার দ্বারা এখন আর কোন কাজ করা হয় না।

গুরু গোবিন্দ সিংহের মন্দির ঃ—এই মন্দিরটী হরিমন্দির নামে বিখ্যাত। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর; ইহার দক্ষিণ দালানে গোবিন্দ সিংহের একজোড়া পাদুকা রক্ষিত করা হইয়াছে এবং পশ্চিম দিকের দালানে একটী সুন্দর সিংহাসনের উপর গ্রন্থ সাহেব স্থাপিত আছেন। ইহা একখানি বৃহৎ ধর্ম্মপুস্তক, সুন্দর শাল আলোয়ানে বেষ্টিত। পৌষ মাসের কৃষ্ণা সপ্তমীর দিন গুরুগোবিন্দ সিংহের জন্মদিন, এই দিনে এখানে উৎসব হয়। গুরুগোবিন্দ সিংহ আর একখানি গ্রন্থ (দশম গুরু গ্রন্থ) রচনা করিয়া আজ্ঞা দিলেন যে ইহার পর আর কেহ গুরু হইতে পারিবে না। গুরু গোবিন্দ সিংহ নিজের জীবনের অধিকাংশ সময় যুদ্ধে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি সম্বত ১৭৩৫ কার্ত্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে (ইং সন ১৭০৮ সালে) মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

পাটনদেবী ঃ—হরিমন্দিরের দক্ষিণ দিকে ছোট পাটন দেবীর মন্দির। এই মন্দিরের দালানে শ্রীমহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

চকের তিন মাইল পশ্চিমে মহারাজগঞ্জে বড় পাটন দেবীর মন্দির। পাটন দেবীর নাম হইতেই ইহার নাম পাটনা হইয়াছে।

নদী ঃ—পাটনায় দুইটী প্রধান নদী আছে গঙ্গা ও শোন। ফতুয়া হইতে পুনপুন নদী আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে।

বৈদ্যনাথ।

ই, আই, রেলওয়ের জসীডী ষ্টেশন্ হইতে এখানে আসিতে হয়। কলিকাতা বা পশ্চিম হইতে আসিতে হইলে জসীডী ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হয়। ষ্টেশন্ হইতে তীর্থস্থান এক মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়। দেওঘর ও বৈদ্যনাথ একই স্থানের নাম। পাণ্ডারা যাত্রীদের ষ্টেশন্ হইতেই লইয়া যায়। ষ্টেশনের অতি নিকটে হাজারীমল ঝুনঝুনওয়ালা ও হরিরাম জইনের ধর্ম্মশালা আছে। সহরের (Town) পশ্চিমে বড় রাস্তার নিকটে বৈদ্যনাথের মন্দির। সহরের বাহিরে সাবডিভিসনের কাছারী বাড়ী এবং সহরের আসেপাসে জঙ্গল ও ছোট ছোট পাহাড় আছে। ইহার নিকট রাজা মদন লালের শিবিরের ভগ্নাবশেষ মিনার (ধ্বজা) ও পাথরের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদ্যনাথে অনেক কুষ্ঠ রোগী জমা হয়। তাহারা রোগ হইতে মুক্ত হইবার আশায় এখানে উপস্থিত হয়। বৈদ্যনাথ শিব লিঙ্গ ১২টী জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একটী। বৈদ্যনাথ শিবলিঙ্গ উচ্চে ১১ অঙ্গুলি এবং তাহার মাথার উপর একটু গর্ত্ত আছে। মাঘ ও ফাল্গুন মাসে অনেক দেশদেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র লোক আসিয়া বৈদ্যনাথের মাথায় গঙ্গার জল আনিয়া ঢালে।

বৈদ্যনাথ শিবের মাথায় জল দেওয়া একটী বিশেষ পুণ্যকার্য্য। মন্দির হইতে উত্তরে সহরের বাহিরে শিবগঙ্গা নামে একটী বড় সরোবর আছে। সেই সরোবরে পাথর বাঁধান ঘাট ও মন্দির আছে। যাত্রীরা ঐ সরোবরে স্নান করিয়া থাকে।

প্রাচীন কথা বিষ্ণুপুরাণ (জ্ঞানসংহিতা তৃতীয় অধ্যায়ে) শিবের ১২টী মুখ্য লিঙ্গের উল্লেখ আছে। যথা :—

১ সৌরাষ্ট্র দেশে—সোমনাথ।
২ শ্রীশৈলে—মল্লিকার্জ্জুন।
৩ উজ্জয়িনীতে—মহাকালেশ্বর।
৪ ওঁকারে—অমরেশ্বর।
৫ হিমালয়ে—কেদার।
৬ ডাকিনীতে—ভীমশঙ্কর।
৭ বারাণসীতে—বিশ্বেশ্বর।
৮ গোদাবরী তটে—অম্বক।
৯ চিতাভূমিতে—বৈদ্যনাথ।
১০ দ্বারকাবনে—নাগেশ।
১১ সেতুবন্ধে—রামেশ্বর।
১২ শিবালয়ে—ধূমেশ্বর।

এই সকল লিঙ্গ দর্শন করিলে জীব শিব লোক প্রাপ্ত হয়। উক্ত শিবলিঙ্গের পূজার অধিকার চতুর্ব্বর্ণেরই আছে। ইহাঁদের নৈবেদ্য ভোজন করিলে সর্ব্ব পাপের নাশ হয়। অতএব উক্ত দ্বাদশ শিবের নৈবেদ্য ভোজন করা উচিত। অতি নীচ জাতীয় লোক যদি জ্যোতির্লিঙ্গের দর্শন করে তাহা হইলে পর জন্মে অতি উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করে এবং শাস্ত্রজ্ঞ হয়।

কর্ম্মনাশা নদীর ধারে বৈদ্যনাথ ধাম, বৃহৎ মন্দিরের ভিতর "রাবণেশ্বর" বা বৈদ্যনাথের মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। এই ধামের কথা শিবপুরাণে এই ভাবে লেখা আছে। এক সময় রাবণ হিমালয় পর্ব্বতের উপর শিব লিঙ্গ স্থাপিত করিয়া শিবের কঠিন তপস্যা করিল;

এমন কি শিবকে প্রসন্ন করিবার জন্য নিজহস্তে নিজের ৯টী মাথা কাটিয়া শিবের মাথায় অর্পণ করিল, তবুও সে শিবকে প্রসন্ন করিতে না পারিয়া নিজের শেষ দশম মুণ্ড কাটিতে উদ্যত হইল, এমন সময় শিব সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সমস্ত মস্তক নিজ হস্তে তাহার ধড়ের সহিত সংলগ্ন করিয়া দিলেন এবং রাবণকে বলিলেন, হে রাবণ তুমি বর চাও। রাবণ মহাবলী হইবার বর প্রার্থনা করিল এবং তাহাকে নিজের নগরে স্থাপিত করিবারও বর চাহিল। শিব বলিলেন বেশ কথা তুমি আমার লিঙ্গ লইয়া যাইতে পার কিন্তু মনে রাখিও, রাস্তায় কোথাও যদি এই লিঙ্গ রক্ষা কর তাহা হইলে উক্ত লিঙ্গ দুইটী সেই স্থানে স্থাপিত হইয়া যাইবে। এইরূপ বলিয়া শঙ্কর দুই লিঙ্গ রূপ হইলেন। রাবণ ঐ লিঙ্গ দুইটীকে মঞ্জুষে রাখিয়া বাঁকে লইয়া চলিল, শিবের মায়ায় রাস্তায় রাবণের অতি বেগে প্রস্রাব পাইল এবং রাবণ সেই বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কোনও একটী গোয়ালাকে (যাহার নাম বৈজু ছিল) এক মুহূর্ত্তের জন্য ধরিতে বলিয়া মূত্র ত্যাগ করিতে বসিল। এই প্রকারে রাবণ দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত প্রস্রাব করিতে লাগিল কিন্তু তাহার প্রস্রাব বন্ধ হইল না; অবশেষে বৈজু গয়লা বিরক্ত হইয়া লিঙ্গ দুইটীকে ভূমিতে নামাইয়া দিল। এই প্রকারে উক্ত লিঙ্গদ্বয় সেই স্থানে পৃথিবীতে স্থিত হইল। প্রস্রাবান্তে রাবণ ঐ লিঙ্গদ্বয় তুলিবার অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই তুলিতে পারিল না! অবশেষে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের অঙ্গুষ্ঠ শিবের মাথার উপর বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। যে লিঙ্গটী রাবণের বাঁকের অগ্রভাগে ছিল সেইটী গোকর্ণে চন্দ্রভাল নামে প্রসিদ্ধ হইল, আর যেটী তাহার বাঁকের পিছনে ছিল সেইটী বৈদ্যনাথ নামে চিতাভূমিতে বিখ্যাত হইল। বিষ্ণু আদি সকল দেবতারা চিতা ভূমিতে গিয়া বৈদ্যনাথের পূজা করিলেন এবং বলিলেন আপনি বৈদ্যের সমান চিভাভূমিতে থাকিয়া মনুষ্যের কল্যাণ করিবেন বলিয়া আপনার নাম বৈদ্যনাথ হইবে। যে আপনার মস্তকে গঙ্গাজল দিবে সে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে।

বৈজুনামে গয়লা রাবণের নিকট হইতে রাবণের বাঁক ধরিয়াছিল, সে শিবের পরম ভক্ত ছিল; শিবের দর্শন, পূজা না করিয়া অন্ন ভোজন করিত না। একদিন সে ভুলক্রমে শিবের দর্শন ও পূজা না করিয়া ভোজনে বসিল, তৎক্ষণাৎ তাহার শিব পূজার কথা মনে পড়িল, সে সেই দণ্ডে ভোজন ত্যাগ করিয়া বৈদ্যনাথের পূজা সমাপ্ত করিল। ইহাতে শিব প্রসন্ন হইয়া বৈজুকে তাহার অভিমত বর চাহিতে আজ্ঞা করিলেন। বৈজু বলিল আপনি আমার নামে বিখ্যাত হউন। মহাদেব এবমস্তু বলিয়া শিবলিঙ্গে লীন হইলেন এবং বৈদ্যনাথের নামে খ্যাত হইলেন।

তারকেশ্বর

শ্রীরামপুর হইতে দুই মাইল, হাওড়া হইতে ১৪ মাইল উত্তরে সেওড়াফুলি ষ্টেশন। এই ষ্টেশন হইতে পশ্চিমে ২২ মাইল ও উত্তরে একটী রেলওয়ে শাখা (Branch) তারকেশ্বরে গিয়াছে। তারকেশ্বরের মন্দির ষ্টেশন হইতে অতি নিকটে। এখানে যাত্রীদের

থাকিবার জন্য ঘর ভাড়া পাওয়া যায়, ঐ বাড়ী সকল মুদীদের জায়গায়, তাহারা যাত্রীদের ভাড়া দিয়া থাকে এবং যাত্রীদের ষ্টেশন হইতে লইয়া যাইবার আগ্রহও করে। ইহারা পূজার সমস্ত জিনিষ বিক্রয় করে। পূজার সময় ব্রাহ্মণেরা যাত্রীদের সঙ্গে লইয়া যায় এবং পূজা করায়। এখানকার লোকেরা পুস্করিণীর জল খায়। মন্দিরের নিকটে কতকগুলি কাঁচা পুস্করিণী আছে, তাহার মধ্যে দুগ্ধ গঙ্গা নামে পুস্করিণীই সর্ব্বপ্রধান।

পূর্ব্বে এ স্থান বিকট জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। পুরাকালে ইহাকে লোকে সিংহল দ্বীপ বলিত। বনের ভিতর দৃষ্টির অগোচরে ভগবানের মূর্ত্তি পড়িয়াছিল; ইহার খোঁজ খবর কাহারও ছিল না। এই জঙ্গলের নিকটে একটী গয়লা বাস করিত, তাহার একটী কপিলা গাভী ছিল, সেই গাভীটী প্রতিদিন জঙ্গলের ভিতরে গিয়া নিজের দুগ্ধের দ্বারায় ভগবান শিবকে স্নান করাইত। গরুর দুধ প্রতিদিন কম হওয়ায় গয়লা তাহার সন্ধানে রহিল। একদিন সে দেখিতে পাইল যে, তাহার গাভীটী ভগবানকে নিজের দুগ্ধ দিয়া স্নান করাইতেছে এবং সে তাহার রহস্য বুঝিতে পারিল। ভগবান মহাদেব "কপিলার" এবম্বিধ সেবায় প্রসন্ন হইয়া গয়লাকে দর্শন দিলেন। গয়লা গ্রামে আসিয়া এই রহস্য প্রচার করিল, এবং সেই স্থানে ভগবানের নিয়ত পূজা হইতে লাগিল। এবং পরে ঐ স্থানে মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের দালানে কঠিন রোগগ্রস্ত রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইবার মানসে অন্নজল ত্যাগ করিয়া ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকে এবং ভগবান তারকেশ্বরের কৃপায় তাহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। শিবরাত্রি ও চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিনে এখানে অত্যন্ত ভীড় হয়, অনেক দূর দেশ হইতে লোক ভগবানকে দর্শন করিতে আইসে।

কলিকাতা কালীঘাট

কালীঘাটের মন্দির হাওড়া ষ্টেশন হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। দেবী দর্শনের জন্য কোন প্রকার কষ্ট করিতে হয় না। গাড়ী, মোটরট্যাক্সী ও ট্রাম ইত্যাদি মন্দিরের নিকট পর্য্যন্ত যায়। দুই তিন আনা পয়সা খরচ করিলে কলিকাতার যে কোনও স্থান হইতে কালীঘাটে যাওয়া যায়। কালীঘাটের পশ্চিমে ভূকৈলাসের রাজভবন এবং ঐ স্থানে ভূকৈলাসের শিব আছে।

কালীঘাটের কালী প্রসিদ্ধ, ৫১টী পীঠস্থানের মধ্যে ইহাও একটী প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। প্রচলিত কথা আছে যে দক্ষ যজ্ঞে নিজ পতিকে অপমানিত হইতে দেখিয়া সতী দেহ ত্যাগ করেন, তখন মহাদেব অতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং শোকে বিহ্বল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্যে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। দেবতারা ভীত হইলেন যে, সৃষ্টি বুঝি নষ্ট হয়। তখন সকলে মিলিত হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন এবং সৃষ্টি রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিলেন।

ভগবান বিষ্ণু শান্ত হইলেন এবং শঙ্করের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীদেহ কাটিয়া ফেলিতে লাগিলেন। এই ভাবে যে যে স্থানে সতীর অঙ্গ কাটিয়া নিপতিত হইল সেই সকল স্থানগুলি তীর্থে পরিণত হইল। এবং সেই স্থান গুলিকে এক একটী পীঠস্থান বলে। এই প্রকারে ৫১টী পীঠস্থান হইল। কালীঘাটে পতিতপাবনী ভাগীরথীর তটে সতীর দক্ষিণ পদের চারিটী অঙ্গুলী নিপতিত হইয়াছিল। মন্দিরটী বৃহৎ এবং দেখিতে অতি সুন্দর, মন্দিরের ভিতরে রক্তবস্ত্রপরিধানা, মুণ্ডমালিনী মুক্তকেশী, প্রভাময়ী, ত্রিনয়না কালীমাতা আছেন। কালী মন্দিরের নিকটে নকুলেশ্বর মহাদেবের মন্দির। কালীমাতার দর্শনের পর নকুলেশ্বর মহাদেবের দর্শন করা বিধেয়। কালী মন্দিরের সম্মুখে আদি গঙ্গা আছেন, ইহাতে স্নান করায় বিশেষ মাহাত্ম্য আছে।

নবদ্বীপ

ইতিহাসে নদীয়া একটী প্রসিদ্ধ নগর (Town) এই স্থানে রাজা বল্লাল সেনের পুত্র বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল। প্রবাদ আছে যে তিনি ১০৬৩ সালে নদীয়া আবাদ করিয়া নিজের রাজধানী স্থাপন করিলেন। ১২০৩ সালে বক্তিয়ার খিলজী নদীয়া আক্রমণ করিয়া হিন্দুদের অধিকার চ্যুত করে এবং রাজার বংশ ধ্বংস করে। নদীয়ার বর্ত্তমান রাজা ভট্টনারায়ণের বংশধর বঙ্গদেশের রাজা আদিশূর—যাহার রাজধানী গৌড়ে ছিল, তিনি কান্যকুব্জ হইতে ৫টী ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, সেই পাঁচটীর মধ্যে ভট্টনারায়ণ অন্যতম আদিশূরের বংশে বিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্বান, দানশীল ও মহৎ লোক ছিলেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে যে সময়ে সিরাজদ্দৌলা ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল সেই সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইংরাজদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। সেই কারণে ইংরাজেরা তাঁহাকে রাজেন্দ্র বাহাদুর পদবী ও ১২টি তোপ প্রদান করেন। যাহা এখনও রাজভবনে তাঁহার বীরত্বের পরিচয় দিতেছে। নদীয়া ন্যায়-শাস্ত্রের স্থান। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সেই জন্য এই স্থান অতি পবিত্র ও প্রসিদ্ধ।

কামাখ্যা দেবী।

গৌহাটী হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে কামাখ্যা নামে একটী পাহাড় আছে। যাহার শিখরে একটি সরোবরের নিকট কামাখ্যা দেবীর (সাধারণ লোকে কামাক্ষাও বলিয়া থাকে) সুন্দর মন্দির আছে। মন্দিরের ভিতর একটী অষ্ট ধাতুর দশভুজা মূর্ত্তির দর্শন হয়। মন্দিরের ভিতর সর্ব্বদা অন্ধকার থাকে বলিয়া দিনের বেলায়ও প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিতে হয়। এই স্থানে একটী অন্ধকারময় গুহার ভিতর যোনি পীঠ বা প্রধান শক্তি পীঠ আছে। উমানন্দ

ভৈরব, উর্ব্বশী, গৌরীশিখর, ব্রহ্মকুণ্ড, পশুনাথ, দশমহাবিদ্যা, ভুবনেশ্বরী, বশিষ্ঠ আশ্রম ইত্যাদি দর্শনের উপযুক্ত। মন্দিরের নিকট মুদীর দোকান ও পাণ্ডাদের বাড়ী আছে ভারতবর্ষের সকল স্থানের লোক (হিন্দু) কামাখ্যায় গিয়া দেবীর দর্শন করিয়া থাকে। মাঘ, ফাল্গুন ও আশ্বিন মাসে এখানে উৎসব হয়। শিবপুরাণে শিবের ১২টী জ্যোতির্লিঙ্গের ভিতর ভীমশঙ্কর লিঙ্গটির কামরূপে স্থান করা হইয়াছে। কিন্তু বোম্বাইয়ের নিকট ভীমশঙ্করকে জ্যোতির্লিঙ্গের ভিতর গণনা করে। দেবীভাগবতে কামাখ্যা (কামরূপ) ত্রিভুমণ্ডলে দেবীর মহাক্ষেত্র। এস্থানে দেবী জাগ্রত আছেন, প্রতি মাসে রজঃস্বলা হন। এখানকার সমস্ত ভূখণ্ডই সাক্ষাৎ দেবী স্বরূপ। কামাখ্যায় যোনি-মণ্ডলের অতিরিক্ত আর কোনও স্থান নাই।

শিবপুরাণঃ—শিবের স্ত্রী সতী নিজ পিতা দক্ষপ্রজাপতির যজ্ঞে পতির অপমান অসহ্য হওয়ায় নিজের শ্বাস ব্রহ্মরন্ধ্রে অবরোধ করিয়া যজ্ঞ স্থলে শরীর ত্যাগ করিয়া নিজলোকে চলিয়া যান। ইহা শ্রবণে শিব অতি ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন। সতীর দেহ স্কন্ধে লইয়া পাগলের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু প্রলয় হইতেছে দেখিয়া সুদর্শন চক্র দ্বারা সতীর মৃতদেহ ছিন্ন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে যে যে স্থানে সতীর ছিন্ন অঙ্গ পতিত হইল সেই সেই স্থান সিদ্ধ স্থান বা সিদ্ধ পীঠ হইল। কামশৈলে সতীর যোনি পতিত হইয়াছিল বলিয়া কামাখ্যা দেবীর আবির্ভাব হইল। যাহাকে কামরূপ বলে।

বামন পুরাণঃ—প্রহ্লাদ কামরূপে গিয়া শিবপার্ব্বতীর পূজা করিয়াছিলেন।

শিবপুরাণঃ—শিবের ১২টী জ্যোতির্লিঙ্গ, ইহার মধ্যে একটী ডাকিনীতে ভীমশঙ্কর নামে বর্ত্তমান। রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের পুত্র ভীম নিজমাতা কর্কটীর সহিত সহ্য পর্ব্বতে থাকিত। সে দশসহস্র বৎসর যাবৎ কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট অপ্রমেয় বর প্রাপ্ত হয় এবং কামরূপের রাজাকে পরাস্ত করিয়া কারারুদ্ধ করিল ও নিজে তথাকার রাজা হইয়া রাজ সিংহাসনে বসিল। এবং মুনি ঋষি ও দেবতাদের উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে কামরূপের রাজা কারাগৃহে নিজ পত্নীর সহিত পার্থিব শিব পূজা করিতে লাগিলেন। ওদিকে দেবতারা শিবকে স্তবে প্রসন্ন করিয়া ভীমের বিনাশের জন্য প্রার্থনা করিলেন। ভীম যখন শুনিল যে রাজা বন্দিগৃহের ভিতর পার্থিব শিব পূজা করিতেছেন, তখন কারাগৃহে প্রবেশ করিয়া কটু বচন কহিতে লাগিল ও কাটিবার জন্য খড়্গ তুলিল। সেই মুহূর্ত্তে শিব পার্থিব লিঙ্গের ভিতর হইতে আবির্ভূত হইয়া নিজ পিনাক দ্বারায় ভীমের খড়্গ শত খণ্ড করিলেন।

ভগবান শঙ্কর ও ভীমের ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, সমুদ্র স্তম্ভিত হইল ও দেবতারা প্রমাদ গনিলেন। এমন সময়ে নারদ শিবের প্রার্থনা করিলেন। তখন ভগবান শঙ্কর নিজ হুঙ্কার দ্বারায় ভীমের সহিত সমস্ত রাক্ষসদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। দেবতারা ভগবান শঙ্করের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে দেব আপনি এই স্থানে থাকিয়া এই

অপবিত্র ভূমিকে পবিত্র করুন, যাহাতে লোকের হিতসাধন হইবে। শঙ্কর দেবতাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন এবং ভীমশঙ্কর নামে কামাখ্যায় প্রসিদ্ধ হইলেন। এই লিঙ্গ দর্শন করিলে মনুষ্য সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়।

পদ্মপুরাণ ঃ—শত্রুঘ্ন যজ্ঞ অশ্ব রক্ষা করিতে করিতে কামাখ্যায় আসিয়া বিশ্ব মাতা কামাখ্যা দেবীর পূজা করিয়াছিলেন।

এখানকার পাণ্ডারা যাত্রীদের থাকিবার স্থান দেয়। এখান হইতে কামরূপ ১৬ মাইল দূরে।

সীতাকুণ্ড (চন্দ্রনাথ)।

এই তীর্থ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রান্তের চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের (A. B. Ry.) সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে নামিতে হয়। পাণ্ডারা যাত্রীদের থাকিবার স্থান দেয়। এখানে সতীর ডান হাত পরিয়া ছিল। ইহাও একটী সিদ্ধ পীঠস্থান। দেবীর নাম ভবানী এবং ভৈরবের নাম চন্দ্র শেখর বা চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথের মন্দির একটী ১১৫৫ ফিট উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাহাড়ে উঠিতে হইলে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হয়। এখানকার পর্ব্বত, জল ও অগ্নির দৃশ্য দেখিলে অবাক হইতে হয়। মহাত্মা গৌতমবুদ্ধের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া (মৃতদেহ দাহ) এই স্থানে হইয়াছিল। **সীতাকুণ্ড, ব্যাসকুণ্ড, নেত্রাগ্নি** (পাথর হইতে আগুন বাহির হয়) **জ্যোতির্ম্ময় বাড়বকুণ্ড** (এই কুণ্ড হইতে সর্ব্বদা আগুন বাহির হয়) **পাদগঙ্গা** (মন্মথ নাথ) এখানে পিণ্ড দান করা হয়। **ভবানী দেবীর মন্দির, শম্ভুনাথ, জগন্নাথ, মন্দাগ্নি, ছত্রশিলা, রামশিলা, অকেটী শিব, বিরুপাক্ষ, পাতালপুরী, হরগৌরী, চন্দ্রশেখর, ক্ষপণাক্ষ, সহস্রধারা, সুরধনী, কুমারী কুণ্ড,** এ সকল স্থান দেখিবার মত।

শ্রীরামপুর।

হাওড়া হইতে ১২ মাইল দূরে শ্রীরামপুর ষ্টেশন্। বঙ্গদেশের হুগলী জেলার অন্তর্গত হুগলী নদীর পশ্চিম ধারে (বারাকপুরের সামনে সাবডিভিসনের সদর স্থান শ্রীরামপুর একটী সহর। এখানে শ্রীজগন্নাথ দেবের একটী বড় মন্দির আছে। এখানকার রথ বিখ্যাত। (মাহেশের রথ) প্রসিদ্ধ। রথের সময় এখানে খুব উৎসব হয়। পুরীর রথের পরই মাহেশের রথ বিখ্যাত। [illegible] যে রথের দিন মহাপ্রভু জগন্নাথ দেব স্বয়ং এখানে আসিয়া আবির্ভূত হন। এখানে [illegible] ডেনমার্কের চার্চ্চ, কলেজ, যাহার ফটকে ৬০ ফিট উচ্চ ৬টী থামের উপর ১[illegible] ফিট লম্বা ও ৬৬ ফিট চওড়া একটী কামরা আছে, স্কুল, হাঁসপাতাল, জুটমিল, পেপার মিল ইত্যাদি দেখিবার উপযুক্ত।

১৭৬৬ সালে শ্রীরামপুরের পাদড়িগণ রামায়ণ ও মহাভার[illegible]াছিল।

ঢাকা।

নারায়ণগঞ্জ হইতে দশ মাইল পশ্চিমোত্তরে এবং গোয়ালন্দ হইতে ১১০ মাইল দূরে ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশন্। বাঙ্গলা দেশে বুড়ি গঙ্গার বাঁ-ধারে, জেলার সদর স্থান ঢাকা সহর অবস্থিত। ইহা ভারতবর্ষের পঞ্চত্রিংশতি এবং বাঙ্গলার তৃতীয় সহর। সহর হইতে আট মাইল দূরে ধবলেশ্বরী নদী ও বুড়িগঙ্গার সঙ্গম হইয়াছে। অনেকগুলি নদী একত্রিত হইয়া ইহার স্বাভাবিক সীমা গঠিত করিয়াছে। পূর্ব্বে মেঘনা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম কোণে পদ্মা এবং পশ্চিমে যমুনা নদী। ধবলেশ্বরী নদী, জেলার মধ্য দিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত আরও অনেকগুলি নদী আছে। এখানে মধুপুর নামে একটী বড় জলঙ্গ আছে। জেলার নদী হইতে (মাছ বিক্রয় দ্বারা) প্রায় এক লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় হয়। এখানে প্রায়ই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। ঢাকেশ্বরী দেবীর নামে অথবা ঢাকবৃক্ষের নামে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। পুরাকালে হিন্দু রাজার রাজ্য ছিল। বোধ হইতেছে মুসলমান্ রাজত্বের পূর্ব্বে এই জেলার এক অংশ (যাহার সীমানায় ধবলেশ্বরী দেবী আছেন) হিন্দুরাজার অধীনে ছিল। নদীর দক্ষিণে বিক্রমাদিত্য রাজার রাজ্য ছিল, বর্ত্তমান বিক্রমপুর পরগণা তাহারই একটী অংশ বিশেষ। উহার উত্তরে পাল বংশের ভূঁইয়া রাজাদের রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের ভগ্নাবশেষ ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে অনেক স্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

ঢাকার মলমল খুব প্রসিদ্ধ (যাহাকে মসলীন বলে) সোনা রূপার উৎকৃষ্ট ও মনোহারী দ্রব্য এখানে প্রস্তুত হয়। এই সকল দ্রব্য কলিকাতায় বিক্রয়ের জন্য রপ্তানি হয়। এম্ব্রডারি, জামদানা ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর কাপড়ের কাজ এখনও এখানে হইয়া থাকে। ঢাকায় মুসল্মানদের মহরম খুব ধুমধামের সহিত হয়। ব্যবসা ইংরাজ ও মাড়োয়াড়ীদেরই হাতে আছে।

গঙ্গাসাগর।

পৌষ বা মাঘ মাসে মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে স্নানের মেলা হয়। কলিকাতা হইতে ৩৮ মাইল ডায়মাণ্ড হার্ব্বার পর্য্যন্ত রেল আছে। কিন্তু ইহার পর নৌকা বা ষ্টীমার ভিন্ন যাওয়া যায় না। সেই জন্য যাত্রীরা কলিকাতা হইতে নৌকা বা ষ্টীমারযোগে গঙ্গাসাগর যায়। কলিকাতা হইতে জলপথে গঙ্গাসাগর যাইতে হইলে পথে চণ্ডিয়াল হাট, বাউড়ীগাঁ, উলুবেড়ে (হাওড়া জেলার অন্তর্গত একটী সবডিভিসন), দামোদর নদীর মোহানায় কুল্য নামে একটী বড় বস্তি আছে। ইহার পর মেদনীপুর জেলার অন্তর্গত "তমলুক" একটী বড় বস্তি, ইহা একটী ঐতিহাসিক বিখ্যাত সহর ও পূর্ব্ব কালে বৌদ্ধদের বন্দর ছিল। তমলুকে একটী মন্দির আছে, উহাকে লোকে "দর্গাহীভীম" বা ভীমা দেবী বলে। এই স্থানটী আশ্চর্য্য রকমে ঘেরা। পুরাকালে ইহা একটী বৌদ্ধ মন্দির ছিল।

গঙ্গাসাগরে একটী খাড়ী উত্তর হইতে আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। মকর সংক্রান্তির দি পশ্চিম ধারে প্রায় এক মাইল জঙ্গল কাটিয়া মেলা বসান হয়। মেলায় রাস্তা করিয়া দিতে হয়। কলিকাতা হইতে নানা রকমের বিস্তর দোকান এবং বাঙ্গলা দেশ হইতে বিক্রীর জন্য অনেক মাদুর আসে। মেলা স্থান হইতে কিছু পশ্চিমে ঘোর জঙ্গল। এই জঙ্গলের ভিতরে জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায়। এই জঙ্গলের ভিতর বাঘ, হরিণ, বন্যবরাহ ইত্যাদি অনেক রকমের হিংস্র জন্তু আছে। কখন কখন বাঘে মানুষ লইয়া যায়।

গঙ্গাসাগরে মহামুনি কপিলের আশ্রম গুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই গুপ্ত আশ্রমটীকে বৈষ্ণব প্রধান রামানন্দ জিউ উদ্ধার করিয়াছেন। সঙ্গমের নিকট একটী টাটীর (খড়ের টাটী) আশ্রয়ে অতি পুরাতন ঘসা প্রতিমূর্ত্তি আছে তাহার দক্ষিণদিকে রাজা ভগীরথের এবং বামে রামানন্দ জিউর ঘসা মূর্ত্তি আছে। যাত্রীরা সঙ্গমে স্নান করিয়া সমুদ্রকে নারিকেল, ফল, ফুল, পঞ্চরত্ন দেয় এবং কপিলের দর্শন ও পূজা করিয়া থাকে। এখানকার অর্পিত পূজা অযোধ্যা মঠের সাধুরা লইয়া যায়। কপিলের স্থান হইতে কিছু উত্তরে মিষ্টি জলের একটী পুষ্করিণী আছে। ইহাতে কেহ স্নান করিতে বা কাপড় কাচিতে পায় না; কারণ ইহার জল কেবল পান করিবার জন্য ব্যবহার হয়। গঙ্গাসাগর তীর্থে পাণ্ডা নাই। মকর সংক্রান্তিং সময় কেবল তিন দিনের জন্য স্নান হয়। কিন্তু মেলা পাঁচ দিন পর্য্যন্ত থাকে।

মাহাত্ম্য—গঙ্গা এবং সমুদ্রের সঙ্গমে স্নান করিলে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। মহারাজ সগরের ৬০০০০ (যাট হাজার) পুত্র কপিল মুনির তেজে ভস্ম হইয়াছিল। মহারাজ সগরের পুত্র অসমঞ্জ, অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান, অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র হইলেন মহারাজ ভগীরথ। মহারাজা ভগীরথ যে সময় শুনিলেন যে, কপিলমুনি তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের ভস্ম করিয়াছেন এবং সেই কারণে তাঁহাদের স্বর্গ লাভ হয় নাই। তখন তিনি নিজ পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করিবার জন্য হিমালয়ে গিয়া এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করিলেন। এবং পতিতপাবনী গঙ্গাকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন, মা! আপনি নিজ পবিত্র জল দ্বারা আমার পূর্ব্ব পুরুষদের স্নান করাইয়া স্বর্গ লোকে পাঠাইয়া দিন! ভক্তের কথা শুনিয়া মা গঙ্গা বলিলেন, প্রথমে তুমি ভগবান শঙ্করকে প্রসন্ন কর, কারণ আমি যে সময় স্বর্গ হইতে অবতরণ করিব, সে সময় আমার বেগ একমাত্র মহাদেব ছাড়া আর কেহ ধারণ করিতে পারিবে না, অতএব তিনি যদি আমার বেগ নিজ মস্তকে ধারণ করেন তাহা হইলে আমি মর্ত্তে নামিতে পারি। একথা শুনিয়া রাজা ভগীরথ কৈলাসে আসিলেন এবং তথায় বহু তপস্যা করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিলেন। শিব প্রসন্ন হইয়া গঙ্গার প্রবল বেগধারা নিজ মস্তকে ধারণ করিবার জন্য তৎপর হইলেন। তখন পতিতপাবনী গঙ্গা অতি বেগে স্বর্গ হইতে মর্ত্তে পতিতা হইলেন এবং রাজা ভগীরথ মা গঙ্গাকে লইয়া যে স্থানে মহারাজ সগরের (৬০০০০ হাজার)

মৃত পুত্রগণ ছিলেন, সেই দিক দিয়া লইয়া চলিলেন ও সমুদ্র পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিলেন অর্থাৎ সমুদ্রের সহিত মিলাইয়া দিলেন। গঙ্গা সমুদ্রকে (অগস্ত্য মুনি গণ্ডুষে পান করিয়াছিলেন) নিজ জল দ্বারা পূর্ণ করিলেন।

বরাহ পুরাণ—গঙ্গাসাগরে স্নান করিলে মনুষ্য ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়। কপিল মুনি ত্রিলোকের শান্তির জন্য যোগ ধারণ পূর্ব্বক সেই স্থানে বিরাজ করিতেছেন।

মুর্শিদাবাদ।

নলহাটী হইতে ২৭ মাইল পূর্ব্বে রেলের শাখা (branch) ভাগিরথী গঙ্গার দক্ষিণ ধার দিয়া আজিমগঞ্জে গিয়াছে। আজিমগঞ্জ মুর্শিদাবাদ জেলার একটী প্রধান ও বড় গ্রাম। তিনপাহাড় জংসন হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ জেলার নলহাটী রেলওয়ে ষ্টেশন। প্রবাদ আছে যে রাজা নলের নামেতেই ইহার নাম নলহাটী হইয়াছে। নলহাটী গ্রাম হইতে ১০০ (এক শত) গজ দূরে পাহাড়ের নীচে পাথরের উপর সীতার চরণ চিহ্ন এবং এক মাইল দূরে পার্ব্বতীর মন্দির আছে। ভাগিরথীর দক্ষিণ ধারে মতীঝিলের সম্মুখে মুর্শিদাবাদের নবাবের খুশবাগ বলিয়া পুরাতন কবরস্থান আছে। বিস্তর কবর ও মস্‌জিদ আছে তন্মধ্যে একটী মস্‌জিদ্ ও দুইটী বৃহৎ অট্টালিকা আছে, তাহার একটী কামরায় সিরাজদ্দৌলা এবং তাহার স্ত্রীর কবর আছে।

চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ড হইতে ২৪ মাইল লাক্‌সার জংসন এবং এখান হইতে ২১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে এ, বি, আর (A. B. Ry.) লাইনে চট্টগ্রাম একটী বড় ষ্টেশন। ইহা বঙ্গদেশের অন্তর্গত। সমুদ্রের ধারে দশ বার মাইল পূর্ব্বে কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণ ধারে অবস্থিত। ট্টচগ্রাম জেলার সদর স্থান ও বাঙ্গলার একটী প্রসিদ্ধ জাহাজের বন্দর। ইহাকে ইংরাজেরা চিটাগঙ্গ (Chittagong) ও মুসল্‌মানেরা ইশ্লামাবাদ বলিয়া থাকে। বিস্তর কুণ্ড ও পুষ্করিণী থাকার দরুণ ইহার জলবায়ু (স্বাস্থ্য) অত্যন্ত খারাপ। এখানে লবণের আমদানী খুব বেশী। ধান, চা ইত্যাদি এখান হইতে অন্যদেশে রপ্তানি হয়।

নদী—কর্ণফুলী ও সঙ্গু এখানকার প্রধান নদী। এই জেলার ভিতর সীতাকুণ্ড, সাতখানিয়া ইত্যাদি ৫টী পাহাড় এক লাইনে অবস্থিত আছে, তাহার মধ্যে সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথ নামে একটি পবিত্র শিখর আছে, ইহা প্রায় ১১৫৫ ফিট উচ্চ। গুল্মা—এখানে নৌকা দ্বারা বাসন, জ্বালানি কাঠ, শুক্‌না মাছ ও বাঁশের তেজারত করা হয়। সমুদ্রের

মাছের জন্য এখানকার বেশীরভাগ লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। চট্টগ্রামে শুক্‌না মাছের বিশেষ আমদানী হয়। জঙ্গলে শরকাটী, বেত ও বাঁশ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। হাতি, বাঘ, গণ্ডার এবং নেকড়েবাঘ ইত্যাদি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

মেদিনীপুর।

কসাই নদীর বাঁ-ধারে অর্থাৎ উত্তর সীমানায় বাঙ্গলা প্রান্তের জেলার বর্ত্তমান সদর স্থান এবং জেলার প্রধান সহর মেদিনীপুর। বালেশ্বর ও মেদিনীপুরের রাস্তায় সুবর্ণরেখা নদী পার হইতে হয়। মেদিনীপুর সকল বড় রাস্তার (Road) কেন্দ্র। এখান হইতে দক্ষিণপশ্চিমে বালেশ্বর এবং জাজপুর হইতে কটকে, পশ্চিমে ঝোর, সম্বলপুর, রায়পুর, রাজনন্দনগ্রাম ও ভাণ্ডারা এবং ভাণ্ডারা হইতে আগে পূর্ব্বোত্তর জব্বলপুর, কটনী, রিওয়া ও মির্জাপুর পর্য্যন্ত, দক্ষিণপশ্চিমে পৈঠব, আহমদনগর ও বোম্বাই অবধি, মেদনীপুর হইতে ৬৮ মাইল রাস্তা। উলুবেড়িয়া হইয়া কলিকাতার, উত্তরে অপ্রসিদ্ধ রাস্তা (Road), বাঁকুড়া হইয়া রানিগঞ্জের দিকে গিয়াছে।

জাজপুর (বৈতরণী)

কটক সহর হইতে ৪৪ মাইল পূর্ব্ব উত্তরে বৈতরণী নদীর দক্ষিণ ধারে কটক জেলার অন্তর্গত ইহা একটী তীর্থ স্থান এবং জেলার সবডিভিসনের সদর স্থান। জাজপুর একটী ছোট সহর (Town) ইহা এক সময় খুব বড় প্রসিদ্ধ সহর ছিল। জাজপুর হইতে ১২ ক্রোশ পূর্ব্বে চাঁদবালী। জাজপুরে একটী সাধারণ সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় ও অনেকগুলি শৈবমন্দির আছে, ইহার মধ্যে অধিকাংশই হীন অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে। এখানে বিস্তর শৈব ব্রাহ্মণের বাস। জাজপুর ভগবতীর লীলাক্ষেত্র। পুরাণে ইহাকে বিরজা ক্ষেত্র বলে। উড়িষ্যার চারিটী পবিত্র স্থানের ভিতর ইহা অন্যতম। জাজপুরের নিকট বৈতরণী নদীর সুপ্রসিদ্ধ ঘাটে **পাদগয়া তীর্থে** যাত্রীরা স্নান ও পিণ্ডদান করিয়া থাকে। এখানে বহু পাণ্ডার বাস। ঘাটে সিঁড়ী আছে। নদীর ধারে একটী মন্দিরের ভিতর কতকগুলি বড় বড় মূর্ত্তি আছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের বাঙ্গলা হাতার ভিতর হস্তি পৃষ্ঠে চতুর্ভুজা ইন্দ্রাণী বারাহী ও চামুণ্ডা এই তিনটি সুন্দর মূর্ত্তি আছে।

প্রাচীন কথা—যুধিষ্ঠীর আদি পঞ্চপাণ্ডবগণ মহর্ষি লোমষের সহিত পর্য্যটন করিতে করিতে গঙ্গাসাগরে স্নান করিয়া সমুদ্রের ধারে ধারে চলিলেন। তাঁহারা কলিঙ্গ দেশ বৈতরণী নদী পার হইয়া এখানে পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন।

বালেশ্বর

কটক হইতে ১০০ (একশত) মাইলদূরে অবস্থিত, জাজপুর হইতে ৫৬ মাইল বুড়ীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ ধারে সমুদ্র হইতে সোজা ৭ মাইল এবং নদীর রাস্তায় অর্থাৎ নদী দিয়া যাইতে হইলে ১৬ মাইল পশ্চিমে উড়িষ্যা প্রান্তে জেলার সদর এবং প্রধান বন্দর বালেশ্বর একটী সহর। লোকে ইহাকে বালাসোরও বলিয়া থাকে। জাজপুর হইতে প্রায় ২০ মাইল পূর্ব্ব উত্তরে ভদ্রক বলিয়া একটী গ্রাম আছে। জাজপুরে গহনা এবং পিতল আদি ধাতুর দ্রব্য বাসন ইত্যাদি অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তুত হয়।

কটক

বী, এন, আর, (B. N. Ry.) লাইনে কটক একটী বড় ষ্টেশন। কটক হইতে ৫৩ মাইল দক্ষিণে (জগন্নাথ ক্ষেত্র) পুরী পর্য্যন্ত একটী সুন্দর রাস্তা আছে। কটক হইতে অনেকগুলি রাস্তা গিয়াছে। একটী রাস্তা দক্ষিণে পুরীতে, দ্বিতীয়—পূর্ব্বোত্তর জাজপুরে, মেদিনীপুরে, বালেশ্বরে। মেদিনীপুর হইতে পূর্ব্বে কলিকাতা ও বাঁকুড়া হইয়া রাণীগঞ্জে। তৃতীয়—পশ্চিমোত্তরে অঙ্গোল হইয়া সম্বলপুরে, চতুর্থ—দক্ষিণ পশ্চিমে রম্ভা, গঞ্জাম, ব্রহ্মপুর, রাজমহেন্দ্রী ও বেলোর হইয়া বিজওয়াড়ায় গিয়াছে।

নদী—কটক সহরের উত্তর-পূর্ব্বে মহানদী, এবং পশ্চিমে কাঠজুড়ী নদী। বন্যা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দুই নদীতেই বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। এখানে জোবরা নামে আর একটী নদী আছে ইহা হইতে এক মাইল দূরে কটক সহরের সামী বাজার, ও দুই মাইল অন্তরে বালুবাজার ও চৌধুরী বাজার। ইহার মধ্যে বালু বাজারটীই বড়। কটক সোনা রূপার গহনার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার মত রূপার দ্রব্য ভারতবর্ষের কোনও স্থানে প্রস্তুত হয় না। কটক উড়িষ্যা জেলার একটি প্রধান তেজারতের জায়গা। কোনও এপিডেমিকের (মহামারী) সময় কটক সহরের ভিতর বাহিরের লোক ঢুকিতে পায় না।

মহানদী—মধ্য দেশের রায়পুর নগরের নিকট হইতে বাহির হইয়া সম্বলপুরের নিকট এক মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণে প্রবাহিত হইবার পর কটক হইতে ৫০ মাইল পূর্ব্বাভিমুখে "ফল্‌সপাইট" সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। সহর হইতে প্রায় এক মাইল দূরে কাঠজুড়ী নদীর দক্ষিণে ১৪ শতাব্দীর রাজা "অনঙ্গ ভীমদেবের রাজবাটী নামে একটি পুরাতন কেল্লার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, উহা উপস্থিত মাটীর ঢিপীতে পরিণত হইয়াছে।

ভুবনেশ্বর

কটক হইতে ১৯ মাইল দক্ষিণে ভুবনেশ্বরের বস্তি। কটক ও খুর্দা জংসানের মধ্যে বি, এন, আরের ইহা একটী ষ্টেশন। বস্তির নিকটেই ভুবনেশ্বরের মন্দির। ইহা জগন্নাথের মন্দির অপেক্ষা পুরাতন ও বৃহৎ। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের কারিগরী জগন্নাথ-দেবের মন্দির অপেক্ষা অধিক সুন্দর। প্রধান মন্দির ১৬০ ফিট উচ্চ। ইহার প্রত্যেক ইটখানি পর্য্যন্ত কারুকার্য্যে পরিপূর্ণ। ইহার ভিতর ৮ ফিট ব্যাসের অর্ঘের উপর দুই হাত উচ্চ একটী শিবলিঙ্গ অবস্থিত আছে। উহাকে এখানকার পাণ্ডারা হরিহরাত্মক বলিয়া থাকে। ষ্টেশনে গরুর গাড়ী পাওয়া যায়। ষ্টেশন হইতে মন্দির দুই মাইল দূরে। এখানে ধর্ম্মশালাও আছে।

এখানে ভগবান শঙ্কর বিষ্ণুর তপস্যা ও আরাধনা করিয়াছিলেন, সেই জন্য ইহাকে একাগ্রকানন ও বলে। এখানেও জগন্নাথের মন্দিরের মত প্রসাদ পাওয়া যায়। **ভগবতী, অনন্ত বাসুদেব, কপিলেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, কোটীতীর্থেশ্বর, অসীবুটেশ্বর, মুক্তেশ্বর, রাজারাণী দেউল, সেনেশ্বর** ঐ কামেশ্বর অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিবার উপযুক্ত। বিন্দুসরোবরে মণিকর্ণিকা ঘাটে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়।

সাক্ষী গোপাল

পুরী হইতে সাত মাইল দূরে বী, এন, আর (B. N. Ry) রেলপথে সাক্ষী গোপাল নামে একটী ষ্টেশন আছে। এখানে একটী ধর্ম্মশালাও আছে। ঘোড়াগাড়ী ইত্যাদিও পাওয়া যায়। শ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শন করিবার পর, ইহার দর্শন করাও বিধেয়। কারণ ইনি শ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শন করিবার সাক্ষী হন, তাহাই ইহার নাম সাক্ষী গোপাল হইয়াছে। এখানকার পাণ্ডারা সাক্ষীর জন্য তাল পাতায় যাত্রিদের নাম লিখিয়া লয় এবং পূজার প্রসাদ দেয়।

শ্রীজগন্নাথপুরী (পুরুষোত্তম ক্ষেত্র)

এই তীর্থ উড়িষ্যা দেশে সমুদ্রের ধারে এবং বি, এন, (B. N. Ry) রেলপথে একটী প্রধান যায়গা। খুর্দারোড জংসন হইতে পুরীর ব্রাঞ্চ লাইন গিয়াছে। ষ্টেশন হইতে মন্দির ২।৩ মাইলের অধিক নহে। এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে। ষ্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ী, মোটর. ও গরুর গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়।

শ্রীমহাপ্রভুর মন্দির—পুরীর প্রধান রাস্তার শেষে পশ্চিম দিকে সমুদ্র হইতে এক মাইল উত্তরে ২০ ফিট উঁচু জমীর উপর (যাহাকে "নীলগিরি" বলে) মহাপ্রভুর মন্দির। মন্দিরের ভিতর অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, নীচ জাতী ও চামড়ার দ্রব্য ঢুকিতে পায় না। মন্দিরের ঘের একদিকে ৬৬৫ ফিট, অন্য দিকে ৬৪৫ ফিট, ইহার চতুর্দ্দিকে ফটক আছে। পূর্ব্বদিকের ফটক সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। দরজার দুইদিকে দুইটী সিংহের মূর্ত্তি আছে, তাহাই ইহার নাম সিংহদ্বার হইয়াছে। সিংহদ্বারের পর কালরঙ্গের একটী পাথরের ৩৫ ফিট উঁচু ১৬ ধারের সুন্দর গরুর স্তম্ভ আছে, এবং ঐ স্তম্ভের মাথার উপর সূর্য্যের সারথী অরুণের মূর্ত্তি বসান আছে। শ্রীজগন্নাথদেবের খাস মন্দিরের পর পূর্ব্বদিকে নৃত্য মন্দির, তাহার পর ভোগমন্দির ও জগমোহন মন্দির। ইহারা সব পরস্পর একস্থানে মিলিত। ইতিহাসের দ্বারায় জানা যাইতেছে যে শ্রীজগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মন্দিরটী রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের নির্ম্মিত। ১৪ বৎসর অনাবরত একনাগাড়ে কাজ হইবার পর ১১৯৮ সালে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হয়। নৃত্যমন্দির ইহার পর তৈয়ার করা হইয়াছে। ভোগমন্দির অনেক পরে মহারাষ্ট্রেরা তৈয়ার করাইয়াছেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের প্রধান মন্দির ১৯২ ফিট উচ্চ ও ৮০ ফিট লম্বা এবং ৮০ ফিট চওড়া। মন্দিরের বাহিরে চতুর্দ্দিকে স্ত্রীপুরুষের অনেক প্রকারের মূর্ত্তি চিত্রিত আছে। মন্দিরের মধ্যে অর্থাৎ কটিভাগে দক্ষিণ কামরায় বলিরাজা ও পশ্চিম কামরায় নৃসিংহদেব ও উত্তর কামরায় কলির প্রতিমূর্ত্তি আছে। মন্দিরের চূড়ার উপর নীলচক্র ও পতাকা ঝুলিতেছে। পুরীতে পাঁচটী পুষ্করিণী আছে। যথা—(১) মার্কণ্ডেয় পুষ্করণী (২) চন্দন পুষ্করিণী, (৩) শ্বেতগঙ্গা পুষ্করিণী, (৪) পার্ব্বতী সাগর পুষ্করিণী, (লোকনাথের নিকটে) (৫) শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন পুষ্করিণী। ইহাকে লোকে পঞ্চতীর্থ বলে)।

পঞ্চ বিখ্যাত শিব আছেন যথাঃ—(১) লোকনাথ, (২) মার্কণ্ডেশ্বর, (৩) কপালমোচন, (৪) যমেশ্বর, (৫) নীলকণ্ঠেশ্বর।

রত্নবেদী—চারি ফিট উচ্চ চৌদ্দ ফিট লম্বা একটী পাথরের বেদী আছে, উহাকে রত্নবেদী বলে। (মন্দিরের ভিতর পশ্চিমদিকে) রত্নবেদীর উপর উত্তরদিকে ছয় ফিট লম্বা একটি সুদর্শন চক্র আছে, ইহার দক্ষিণদিকে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মূর্ত্তি আছে। শ্রীজগন্নাথদেবের একদিকে লক্ষ্মী অন্য দিকে সত্যভামা আছেন, আর সম্মুখে ধাতু নির্ম্মিত ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতিমা রহিয়াছে।

বেশ

আরতী ও শৃঙ্গারবেশঃ—খুব ভোরে মঙ্গল আরতী ও বেশ হয়। ইহার পর অবকাশবেশ, তাহার পর প্রহর বেশ, তাহার পর চন্দনলেপ বেশ হয়। সকাল

অপেক্ষা বড় শৃঙ্গার বেশ যাহা গোধূলির সময় সন্ধ্যাকালে ধূপ দিবার পর হয়। ইহার অতিরিক্ত সময় সময় শ্রীজগন্নাথদেবের দামোদর বেশ, বামনবেশ, বুদ্ধবেশ, গণেশবেশ ইত্যাদিও হইয়া থাকে।

মন্দিরের ভিতর মুক্তি মণ্ডপ, অক্ষয় বট যাহাকে লোকে অক্ষমাল বলে, এই স্থানে প্রলয় কাল হইতে বিষ্ণুর বালক মূর্ত্তি রহিয়াছে। (যাহা বালমুকুন্দ বলিয়া বিখ্যাত) এই ধারে রোহিণীকুণ্ড নামে একটি ছোট কুণ্ড আছে এবং ইহার নিকটে চতুর্ভুজা বিমলাদেবী, নৃসিংহ দেব, লক্ষ্মীদেবী, একাদশী, বসুদেব ইত্যাদির মন্দির আছে। বড় মন্দিরের পশ্চিম দিকে সরস্বতী, কর্ম্মাবাই, বিধাতা (যিনি কপালে কর্ম্মাকর্ম্ম ও ভাগ্য লেখক) কালী ইত্যাদির মূর্ত্তি আছে। উত্তর দরজার নিকট শীতলা মায়ের মূর্ত্তি আছে। এই হাতার (চকের) ভিতরে প্রায় ৫০টী দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি আছে।

বাহিরের হাতায় (চকে) সিংহ দরজার উপরে ঘরের ভিতর ২১টী সিঁড়ী উঠিবার পর মন্দিরের দালান। দরজার দক্ষিণদিকে মহাপ্রসাদ বিক্রেতাদের দোকান। ফটকের মেরাপের (arch) কুলুঙ্গিতে শ্রীজগন্নাথদেবের একটী ছোট প্রতিমূর্ত্তি আছে, যাহা পতিত-পাবন নামে বিখ্যাত। অস্পৃশ্য জাতি, যাহারা মন্দিরের ভিতর ঢুকিতে পায় না, তাহারা এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকে। সিংহদ্বারের উত্তরদিকে স্নানের বেদী, যেখানে জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীজগন্নাথ জিউ স্নান করিতে যান। দ্বারদেশের নিকটে একটী বাড়ী আছে, যেখানে শ্রীলক্ষ্মীদেবী মহাপ্রভুর স্নান দেখিতে বসেন। এই প্রকার আর একটী বাড়ী আছে, যেখানে স্নানের পর মা লক্ষ্মী মহাপ্রভুকে আদরপূর্ব্বক আনিতে যান। বাহিরের চকে শ্রীজগন্নাথ দেবের পাকশালা। হাতী-ফটক হইতে পশ্চিম-দক্ষিণে বৈকুণ্ঠ নামে একটী ছোট বাড়ী আছে, যেখানে পাণ্ডারা যাত্রীদের আটকে সঙ্কল্প করায়। জগদীশের মন্দিরের বহির্ভাগে ত্রিমুখ কপাল মোচন শিবের মন্দির ও কিছু দক্ষিণে একটী মন্দিরের ভিতর যমেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। এখান হইতে আর একটু দক্ষিণে গোপীনাথের মন্দির।

শ্বেতগঙ্গা:—স্বর্গদ্বারের রাস্তার নিকটে শ্বেতগঙ্গা নামে একটী পুষ্করিণী আছে, ইহার ধারে শ্বেতকেশবের মন্দির। শ্বেতকেশবের মূর্ত্তি কাষ্ঠ নির্ম্মিত, কলেবরের সময়ে ইহারও কলেবর বদলান হয়।

স্বর্গদ্বার—সমুদ্রের ধারে, শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে এক মাইল দূরে পোয়া মাইল লম্বা স্বর্গদ্বার, এখানে যাত্রীরা সমুদ্রের ঢেউয়েতে স্নান করে।

মলুকদাস ও কবীরদাস—সমুদ্রের ধারে ছোট ছোট অনেকগুলি মঠ আছে। মলুকদাসের মঠে মলুকদাসের মূর্ত্তির দর্শন হয় এবং রুটী ও শাক প্রসাদ পাওয়া যায়। কবীর দাসের মঠে কবীরের চৌরার দর্শন হয় এবং ভাতের ফেন বা জল প্রসাদ স্বরূপ দেয়, অন্য ভাষায় যাহাকে তুরাণী বলে। গুরুনানকেরও মঠ আছে। মরিবার পূর্ব্বে লোকে স্বর্গদ্বারে আসিয়া বাস করে।

লোকনাথ মহাদেব—শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে এক মাইল দূরে লোকনাথ মহাদেবের মন্দির। এখানে জলের একটী প্রচ্ছন্ন ধারা (stream) আছে, মন্দির সর্ব্বদা জলে পরিপূর্ণ থাকে। শিবলিঙ্গ জলের ভিতরে। এই জল নালাদিয়া পার্ব্বতী কুণ্ডে পড়ে। শিবচতুর্দ্দশীর দিন সমস্ত জল বাহির হইয়া যাইলে পর শিবের দর্শন হয়। তাহার পর মন্দিরটি দশ হাত জলে ডুবিয়া যায়। শিবচতুর্দ্দশীর দিনে প্রায় ৩০ হাজার লোকের ভীড় হয়।

মার্কণ্ডেয় পুষ্করিণী—শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে ইহা প্রায় দুই মাইল দূরে। প্রথমে সকলে এই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া তাহার পর মহাপ্রভুর দর্শন করিতে যায়।

চন্দন পুকুর—মার্কণ্ডেয় পুষ্করিণীর পূর্ব্ব ফটকের রাস্তায় প্রায় ২২৫ গজ চওড়া এবং লম্বা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন কোন কোন দেবতাদের নৌকার উপর তুলিয়া এই পুষ্করিণীতে জলক্রীড়া করান হয়।

জনকপুরী—শ্রীমহাপ্রভুর মন্দির হইতে প্রায় দুই মাইল ব্যবধানে জনকপুরী। পুরাণের মতে ইহার নাম গুণ্ডিচ। সর্ব্বপ্রথমে এইস্থানে কাষ্ঠের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ হইয়াছিল। সেই জন্য ইহাকে জনকপুরী অথবা জন্মস্থান বলে। এখানকার প্রধান মন্দিরের ভিতর ৪ ফিট উচ্চ ১৯ ফিট লম্বা একটী পাথরের বেদী আছে, রথের সময় এই বেদীর উপর প্রধান তিনটী মূর্ত্তি বসান হয়। ইহা বহু পুরাতন মন্দির।

ইন্দ্রদ্যুম্ন পুকুর—জনকপুরী হইতে কিছু দূরে বর্ত্তমান। পুষ্করিণীর নিকটে একই মন্দিরে নীলকণ্ঠ ও ইন্দ্রদ্যুম্ন, অন্য আর একটী মন্দিরের ভিতর পদ্মনাভ আছেন।

প্রবন্ধ—শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের আয় প্রায় ৫।৬ লক্ষ টাকা। যাত্রীদের পূজা হইতেই ছয় লক্ষ টাকার কাছাকাছী আয় হয়। মন্দিরে প্রায় ছয় হাজারের উপর কর্ম্মচারী আছে। বিশ হাজারের উপর নরনারী ভরণ পোষণ পাইয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রায় সাত শত লোক মন্দিরের কাজ করে (অর্থাৎ নিযুক্ত চাকর)। ইহার মধ্যে কতক মহাপ্রভুর বিছানা করিবার জন্য নিযুক্ত, কতক মহাপ্রভুর ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য নিযুক্ত, কতক জল দিবার জন্য, কতক খাবার, কতক পান দিবার জন্য, কতক কাপড় কাচিবার জন্য, কতক পোষাক গুছাইয়া তুলিবার জন্য নিযুক্ত আছে। চারি শত লোক রান্না করে। ১২০টী বালিকা নৃত্য করে। ১০০০ এক সহস্র পূজারী বা পাণ্ডা। ইহার ভিতর অনেকেই ধনী (বড়লোক) কিন্তু সকল প্রবন্ধের দায়িত্ব পূরীর রাজার।

নিত্যসেবা—প্রাতঃকালে ঘণ্টা বাজাইয়া শ্রীমহাপ্রভু, বলভদ্র, ও সুভদ্রা দেবীর ঘুম ভাঙ্গান হয়, পরে কপাট খুলিয়া ধূপ দেওয়া হয়। কিছু জল খাবারের দ্রব্য সিংহাসনের সম্মুখে রাখা হয়। সমস্ত ভোগের অপেক্ষা সকালের ভোগ, দ্বিপ্রহরের ভোগ, সন্ধ্যার ভোগ ও শৃঙ্গার ভোগ প্রধান। রাজ্যের জিনিষ (সামগ্রী) খাস ভোগ-মন্দিরেতেই রাখা হয়।

গোপাল বল্লভ নামক একটী প্রধান দ্রব্য ও রাজ-প্রাসাদের তৈয়ারী দ্রব্য প্রতিদিন ভোগে দেওয়া হয়। এই ভোগ বিক্রয় হয় এবং ইহার দাম রাজার হিসাবে রাখা হয়। চারিটী ভোগের সময় এক ঘণ্টা করে পট্ট বন্ধ থাকে।

প্রবাদ আছে যে কর্ম্মা নামে একটী স্ত্রীলোক বাৎসল্য ভাবের উপাসনা করিত এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিয়াই শৌচাদি ক্রিয়া না করিয়া (বাসিমুখে বাসি কাপড়ে) একটী ছোট পাত্রে ভগবানের জন্য খিচুড়ী চড়াইয়া দিত এবং খিচুড়ী তৈয়ার হইলে পর সেই অবস্থাতেই অত্যন্ত ভক্তি ও প্রেম সহকারে ভগবানকে ভোগ দিত। দয়াময় ভক্তবৎসল ভগবান পুরুষোত্তম পুরী হইতে আসিয়া সেই খিচুড়ী ভোগ খাইতেন। এক দিন কোনও পরিব্রাজক সাধু কর্ম্মবাইকে ঐ প্রকারে ভোগ দিতে দেখিয়া শুদ্ধ ও আচার বিচারের সহিত ভোগ দিতে উপদেশ দিয়া চলিয়া গেল। কর্ম্মাবাই সাধুর উপদেশানুসারে ভোগ দিল। এই দিনে ভগবানের ভোগে বিলম্ব হওয়ায় ভগবান ভক্তদের আদেশ করিলেন এবং পাণ্ডারা সেই পরিব্রাজক সাধুকে ধরিয়া আনিল এবং তাহাকে বলিল "তুমি শীঘ্র যাইয়া কর্ম্মাবাইকে পুনরায় তাহার পূর্ব্ব রীতিতে ভোগ প্রস্তুত করিতে বল"। সাধু তৎক্ষণাৎ গিয়া কর্ম্মাবাইকে তাহার পূর্ব্ববৎ ভোগ দিতে বলিল। কর্ম্মাবাই প্রসন্ন হইয়া আগেকার মত স্নানাদি ক্রিয়া না করিয়াই খিচুড়ী প্রস্তুত করিয়া ভগবানকে ভোগ দিল। ভক্তবৎসল ভগবান এইরূপে নিজ ভক্তের মান বাড়াইলেন। তাহাই এখন পর্য্যন্ত কর্ম্মাবাইয়ের খিচুড়ী ভোগ সর্ব্ব প্রথমে দেওয়া হয়।

পুরীর উৎসব—মোট ১৮টী প্রধান উৎসব হয়, নিম্নে তাহার বর্ণনা দেওয়া হইল।

(১) স্নানযাত্রা—রথযাত্রা ছাড়া আর সকল উৎসব হইতে ইহা প্রধান। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিন শ্রীজগন্নথ দেব, বলভদ্র, ও সুভদ্রা দেবীকে স্নানবেদীর উপর আনা হয় এবং অক্ষয় বটের পবিত্র কূপ জলে ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় স্নান করান হয়, তাহার পর সুন্দর পোষাক পরাইয়া মন্ত্রের দ্বারায় পূজা করিবার পর ১৫ দিন পর্য্যন্ত একটী ঘরে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই এক পক্ষ কাল পর্য্যন্ত বাহিরের ফটকও বন্ধ থাকে, পাকশালা ইত্যাদি সমস্তই বন্ধ হইয়া যায়। প্রবাদ আছে যে অধিক স্নান করার দরুণ দেবতারা অসুস্থ হন। এমন কি তাঁহাদের জন্য ঔষধ (পাঁচন) পর্য্যন্ত তৈয়ার করা হয়।

(২) রথযাত্রা—ইহা পুরীর মুখ্য ও প্রধান উৎসব। শ্রীজগন্নান দেব, বলভদ্র ও সুভদ্রা দেবী, ইঁহারা সমারোহের সহিত রথের উপর বসিয়া জনকপুরে নিজেদের বিশ্রাম বাটিকায় যান। শ্রীজগন্নাথ দেবের রথ ৪৫ ফিট উচ্চ ৬৫ ফিট লম্বা। ইহাতে ৭ ফিট্ ব্যাসের ১৬ টী চাকা আছে। বলভদ্রের রথও এই প্রকার, কিন্তু ইহা অপেক্ষা কিছু ছোট; তিন জনই সুন্দর অলঙ্কার পরিধান করিয়া রথের উপর আসিয়া বসেন। পুরীর রাজা হাতী ঘোড়া, পাল্কী, সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি লইয়া ঐ সময় আসিয়া যোগদান করেন। রাজা রথের নিকট পায়ে হাঁটিয়া আইসেন এবং রথের সাম্‌নের পথ (রাস্তা) নিজ হস্তে সুন্দর

ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করেন। পূজা করিবার পর তিনটী রথের দড়ি ধরিয়া সর্ব্বাগ্রে টান দেন। তাহার পর ৪২০০ কুলী যাহাদিগকে এই কার্য্যের জন্য বিনা খাজনায় জমি দেওয়া হইয়াছে। এবং যাত্রীদের মধ্যেও অনেকে ভক্তিসহকারে ও উৎসাহের সহিত রথ টানিয়া থাকেন। রথের চাকা বালিতে বসিয়া যাইলে অনেক দিন যাবৎ রাস্তায় থাকিয়া যায়। শ্রীমহাপ্রভু যত দিন রাস্তায় অবস্থান করেন, লুচি পুরীর ভোগ দেওয়া হয় ও জনকপুরে পৌছিবার পর তিন দিন ভাত ইত্যাদির ভোগ দেওয়া হয়। চতুর্থ দিনে মা লক্ষ্মী সাজসজ্জা করিয়া অতি সমারোহের সহিত নিজের স্বামী দর্শন করিতে আসেন। এই তিথিকে লোকে হরিপঞ্চমী বলে। দশমীর দিনে সকল দেবতারা পুনরার রথে চড়িয়া ফিরিয়া আসেন। যাহাকে লোকে উল্টা রথ বলিয়া থাকে। বিজয় দ্বারে ফিরিয়া আসিবার পর উৎসব করা হয়। স্পর্শ দোষ কাটাইবার জন্য মূর্ত্তিগুলির সংস্কার করা হয়।

(৩) হরিশয়নী একাদশী—আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীর দিন ভগবানের শয়ন উৎসব হয়।

(৪) ঝুলন উৎসব—শ্রাবণ মাসের শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মদনমোহন ঝুলনে থাকেন। এই দিনে নাচ গান ইত্যাদি আনন্দ হইয়া থাকে।

(৫) জন্মাষ্টমী—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই উৎসব হইয়া থাকে।

(৬) পার্শ্বপরিবর্ত্তন—ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীর দিন।

(৭) কালিয়দমন—ইহাতে উৎসব হয়।

(৮) বামনজন্ম—ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিন।

(৯) শরৎপূর্ণিমা—আশ্বিন মাসের পূর্ণিমার দিন।

(১০) দেবোত্থান—কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশীর দিন।

(১১) ভগবানকে গরম কাপড় পরান উৎসব—মাঘমাসে যে দিন শীত কালের কাপড় পরান হইবে, সেই দিন এই উৎসব সমারোহের সহিত হইয়া থাকে।

(১২) পুষ্পাভিষেক—পৌষ মাসের পূর্ণিমার দিন হয়।

(১৩) মকর সংক্রান্তি—যেদিন মকরে সূর্য্য হইবে।

(১৪) ফুলদোল—পুরীতে দোলও খুব সমারোহের সহিত হয়, এবং ইহা একটী প্রসিদ্ধ উৎসব। এই দিনে মদনমোহন জীউ দোল খান, সকলে উহার উপরে ফাগ দেয়। এই দিনেই শ্রীজগন্নাথ দেবের রাজ ভেটের উৎসব হয়।

(১৫) রামনবমী—এই দিনে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জিউর বেশ ধারণ করেন।

(১৬) মদনমঞ্জরীকা—দমন নামের দৈত্যকে বিনাশ করিবার জন্য।

(১৭) চন্দন যাত্রা--বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন চন্দন পুষ্করিণীতে এই যাত্রা হয়। ঐ সময় দেবতাদের তোলা (চল) প্রতিমাকে নৌকায় বসাইয়া চন্দন পুষ্করিণীতে জলক্রীড়া করান হয়। তাল বৃক্ষের দ্বারায় বৃন্দাবন তৈয়ার করিয়া ফুল দিয়া সাজান হয়।

(১৮) রুক্মিণীহরণ—ইত্যাদি। ইহার অতিরিক্ত সময় সময় আরও অনেক উৎসব হইয়া থাকে।

সংক্ষেপে পুরাতন কাহিনী (পদ্মপুরাণ)

শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন অশ্ব রক্ষা করিতে করিতে অশ্বের পিছনে যাইতে ছিলেন, এমন সময়ে একটী পর্ব্বতাশ্রম দেখিয়া নিজ মন্ত্রীকে ইহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী সুমতি বলিলেন, ইহা নীল পর্ব্বত এই স্থানে পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথ জিউ বিরাজ করেন। এই মূর্ত্তি দর্শন, পূজন ও ইঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করিলে প্রাণী চতুর্ভূজ হয়।

পুরাতন ইতিহাস—কাঞ্চী নামে প্রসিদ্ধ পুরীতে মহারাজ রত্নগ্রীব রাজত্ব করিতেন। তিনি নিজ পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া তীর্থ ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। একদিন রাজা কোন তপস্বী ব্রাহ্মণকে নিজ সভায় দেখিয়া তাহার নিকট তীর্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন, যে আমি গঙ্গাসাগর হইতে নীল পর্ব্বতে গিয়া দেখিলাম ভীলেরা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের সহিত চতুর্ভূজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তখন আমি তাহাদের ঐ চতুর্ভূজ মূর্ত্তি-ধারণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। কিরাতগণ বলিল আমাদের মধ্যে একটী ছোট বালক খেলা করিতে করিতে এই নীল পর্ব্বতের শিখরে (উপরিভাগে) উঠিয়া পড়িল। এবং সেখানে মণি-মাণিক্যের দ্বারা খচিত সুবর্ণের একটী অদ্ভুত দেবালয় দেখিতে পাইল। সে মন্দিরের ভিতরে লক্ষ্মী নারদাদি দ্বারা সেবিত শ্রীহরিকে দেখিতে পাইয়া নিকটে যাইল। যখন দেবতারা পূজা করিয়া নৈবেদ্য দিয়া নিজ নিজ লোকে চলিয়া গেলেন, তখন সে বালক উক্ত নৈবেদ্য হইতে ভাতের একটী কণা যাহা সেখানে পড়িয়া ছিল তুলিয়া লইল, যাহার দ্বারায় সে চতুর্ভূজ হইল। ঐ বালকের মুখে এই সকল সমাচার অবগত হইয়া আমরাও সকলে একত্রিত হইয়া দেবাদিদেবের দর্শন করিলাম এবং সেখানকার সুস্বাদ প্রসাদ ভক্ষণ করিলাম, যাহার দ্বারায় আমাদেরও চতুর্ভূজ মূর্ত্তি হইল। এই বলিয়া তপস্বি ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন, আমিও কিরাতের এমন সুন্দর রূপ দেখিয়া গঙ্গাসাগরে স্নান করিলাম এবং ঐ নীল পর্ব্বতের শিখরে দেবতার দ্বারায় বন্দিত ভগবানের দর্শন করিয়া সেখানকার প্রসাদ (ভাত) ভক্ষণ করিলাম ও চতুর্ভূজ মূর্ত্তি পাইলাম। ব্রাহ্মণের মুখে সংবাদ ও আজ্ঞা পাইয়া রাজা রত্নগ্রীব শ্রীপুরুষোত্তমের দর্শনের লালসায় গঙ্গাসাগরে স্নান করিয়া নীল পর্ব্বতের রাস্তা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া বলিল, মহারাজ নীল পর্ব্বত তো এই স্থানেই। এই স্থানেই আমি ভিলদের দেখিয়াছিলাম, আর এই স্থান দিয়াই আমি পর্ব্বতের উপর উঠিয়াছিলাম। মহারাজ যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীপুরুষোত্তমের দর্শন না পান এই স্থানে অবস্থান করুন। তখন রাজা ভগবানের উপাসনা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ভগবানের অরাধনায় মহারাজের পাঁচদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। তখন ভগবান ত্রিদণ্ডির রূপ ধারণ করিয়া রাজার নিকটে আসিয়া বলিলেন রাজন! কল্য মধ্যাহ্ন সময় শ্রীহরি তোমায় দর্শন দিবেন। তুমি তোমার মন্ত্রী, স্ত্রী, এই তপস্বী ব্রাহ্মণ ও তোমার নগরের করম্ব নামে কোরী সে এক জন মহৎ সাধু, সকলেই নীল পর্ব্বতে যাইবে এবং শ্রীহরির ধাম দেখিতে পাইবে। দ্বিতীয় দিবস মধ্যাহ্ন সময় রাজা নীল পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। তখন ইঁহারা সকলে শুভমুহূর্ত্ত দেখিয়া নীলপর্ব্বতে উঠিলেন; ঐ পর্ব্বতের প্রত্যেক শিখরে সোনার মন্দিরে সোনার সিংহাসনে শ্রীহরির চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে প্রণাম করিলেন। ইহার পর সকলেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উত্তম রথে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুলোকে চলিয়া গেলেন।

দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিলেন, জ্যৈষ্ঠ মাসে বিষ্ণু ভগবানকে যত্ন পূর্ব্বক স্নান করাইলে ব্রহ্মহত্যাদি সহস্র পাপ বিনষ্ট হয়। আষাঢ় মাসের রথযাত্রায়, আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে বিষ্ণুস্নানের মহোৎসব করা উচিত। ঝুলন উৎসব, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ও বামন দ্বাদশী, আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে মহামায়ার পূজায়, কার্ত্তিক মাসে দামোদরের জন্য দীপ দান, পৌষ মাসে পুষ্প জল দিয়া ভগবানকে স্নান, মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন গুড় মিশ্রিত তণ্ডুল (চাউল) ও তিল দিয়া ভগবানের পূজা, দোলোৎসবে ভগবানকে কুমকুম্ আর ফাগ দিয়া পূজা, এই সকল সময় অনুসারে করিলে বিশেষ ফল হয়। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দোলমঞ্চের উপর একবার দেখিলে মনুষ্য সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হয়। বৈশাখ মাসে দমনারোপণ করিয়া সমস্ত পদার্থ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সমর্পণ করা উচিত। বৈশাখ মাসে শুক্লা তৃতীয়ার দিন ভগবানকে জলের ভিতর বসাইয়া অথবা দমনারোপণ মণ্ডপে শ্রীহরির পূজা করা একান্ত বিধেয়। গন্ধাষ্টককে অন্য সুগন্ধি বস্তুর দ্বারায় ভিন্ন করিয়া বিষ্ণুর অঙ্গে ছোয়ান বা লাগান উচিত এবং ঐ স্থানে বৃন্দাবন সাজাইয়া সকল রকম বৃক্ষ রোপণ করিবে.

মন্দির দর্শনের নিয়ম—মন্দিরের ভিতর সকল হিন্দু দর্শন করিতে যাইতে পারে কিন্তু নিম্নলিখিত জিনিসগুলি পরিত্যাজ্য।

১। মন্দিরের বাহিরের জল।

২। বাজারের রিদ্ধান্ন।

৩। চামড়ার কোনও জিনিষ।

৪। ছাতা (যদি উহাতে চামড়া যুক্ত থাকে)।

৫। মন্দিরে থুতু ফেলা।

৬। কুকুর নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

মন্দিরের ভিতরে যাত্রা করিবার বাধ।

মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শঙ্খচক্রাঙ্কিত সিংহ দ্বারকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া শ্রীজগন্নাথ জিউর মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত। প্রথমে পতিত পাবন জিউর দর্শন করা বিধেয়, যিনি সিংহদ্বারের রক্ষক। তাহার পর বিশ্বনাথ, ভোগমণ্ডপ, অজাননাথ গণেশের দর্শন করিয়া বটেরা মহাদেবের দর্শন করিয়া পটমঙ্গল দেবীর দর্শন করা উচিত। বটবৃক্ষ পরিক্রম করিয়া অনন্ত ভগবান ক্ষেত্রপাল বা নরসিংহ জিউর দর্শন করা বিধেয়। ইহার মধ্যে মুক্তিমণ্ডপ আছে, উহাও দর্শন করিতে হয়। রোহিণী কুণ্ড—যে কুণ্ডের জল পান করিয়া বায়স (কাক) চতুর্ভুজ মূর্ত্তি পাইয়াছিল। এই স্থানেই বিশালাক্ষী দেবী আছেন। সরস্বতী দেবী, জগন্মাতা লক্ষ্মী, অর্কক্ষেত্র নিবাসী পাতালেশ্বর মহাদেব, উত্তরে উত্তরা-সনাদেবীর দর্শন করা খুব দরকার। পদ্ম, সুদর্শন চক্রকে জগন্নাথ জীউর দর্শন করিবার অভিলাষ জানাইয়া ও প্রার্থনা করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। গরুড়ের পিছন দিক দিয়া দ্বারপাল জয় বিজয়ের নিকট গিয়া দর্শন ও নমস্কার করিয়া অগ্রসর হইবে। বলভদ্র জিউ, জগন্নাথ জিউ, সুভদ্রা জিউ, সুদর্শন জিউর দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও পূজা করিবে এবং যথাসাধ্য ভেট দিবে। ব্রহ্মভাগবত স্তুতি করিয়া তবে যাইতে হয়। কপাল মোচন, নীলকণ্ঠ, যমেশ্বর, বিশ্বেশ্বর ও লোকনাথ মার্কণ্ডেয় দর্শন করিবে। যাহারা এই প্রকারে পরিক্রম করিয়া শ্রীজগন্নাথ জিউর দর্শন করে, তাহারাই সাক্ষাৎ দর্শনের ফল পায়।

পুনরায় এই ভাবে দর্শন করা উচিত। সমুদ্রে স্নান, শ্বেতগঙ্গায় স্নান, মার্কণ্ডেশ্বর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া জনকপুর, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান, দান, পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া জনকপুর মন্দিরের সকল দেবদেবীর দর্শন পূজন করিয়া পুনশ্চ বেণীহনুমান, লোকনাথ, নীলকণ্ঠ, কপালমোচন, যমেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, বিল্বেশ্বর, কানপাতা মহাবীর, শ্বেতমাধব, ভাস্করকূপ, চক্রতীর্থ, নৃসিংহ, বটকৃষ্ণ আদির দর্শন করিয়া যথাশক্তি তীর্থের ব্রাহ্মণ, পাণ্ডা ক্ষুধাতুরের সাদর সম্মান করিয়া আশীর্ব্বাদ লইবে। কমপক্ষে ত্রিরাত্রি বাস করিবে, তাহার পর নিজ স্থানে যাইবে। রাস্তায় সাক্ষী গোপালের দর্শন করিয়া তীর্থের ব্রাহ্মণ ও ক্ষুধার্ত্তদের আশীর্ব্বাদ লইয়া ভুবনেশ্বর মহাদেবের দর্শন করিয়া, বৈতরণী নদীতে স্নান, গো দান ও শ্রাদ্ধ করিয়া নিজ নিজ স্থানে যাইবে। বাড়ীতে আসিয়া যতদিন পর্য্যন্ত তীর্থ যাত্রার উদ্যাপন না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যে থাকিবে। পশ্চাতে যথা শক্তি গুরু, ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকদিগকে ভোজন করাইয়া, নিজ কুটুম্ব ভাই বন্ধু ইষ্ট মিত্র প্রতিবাসী ইত্যাদির সহিত আনন্দভোজন করিয়া জীবন্মুক্তির ফল লইবে।

পুরীতে দেখিবার উপযুক্ত স্থান।

১। শ্রীশ্রীজগন্নাথ জিউ।

২। সিদ্ধবকুল।

৩। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মঠ।

৪। নানক মঠ। (এই স্থানেতেই পাতালগঙ্গা)

৫। চৈতন্যমঠ।

৬। স্বর্গদ্বার।

৭। কানপাতা হনুমান। (মন্দির হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে) প্রবাদ আছে যে সুভদ্রা দেবী সমুদ্রের শব্দ শুনিয়া ভয় পাইয়াছিলেন, তাহাই শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে শ্রীহনুমান জীউ সর্ব্বদা কান পাতিয়া বসিয়া আছেন, যাহাতে শব্দ মন্দিরের ভিতরে না যাইতে পারে। এখানেও পিণ্ড দানের ব্যবস্থা আছে।

৮। সুদামাপুরী।

৯। হরিদাসের মঠ।

১০। কবীরদাসের মঠ।

১১। বিদুর আশ্রম।

১২। শ্বেতগঙ্গা।

১৩। চক্রতীর্থ। বিশাল দারু বৃক্ষ, যাহার দ্বারায় শ্রীজগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি তৈয়ার করা হইয়াছিল, এইস্থানেই পাওয়া গিয়াছিল।

১৪। বেড়ী হনুমান। এই খানে হনুমান জিউ পাহরায় নিযুক্ত ছিলেন কিন্তু তিনি বিনা আজ্ঞায় অযোধ্যা চলিয়া গিয়াছিলেন, সেই জন্য পায়ে বেড়ী পড়িয়াছে।

১৫। চক্রনারায়ণ জিউ।

১৬। জনকপুর। বিশ্বকর্ম্মা চারিটী মূর্ত্তি এই স্থানে তৈয়ার করিয়াছিলেন।

১৭। ইন্দ্রদ্যুম্ন পুষ্করিণী। এই স্থানে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য গো দান করিয়া ছিলেন। গরুর ক্ষুরের চাপে পৃথিবীতে গর্ত্ত হইয়াছিল। এবং সঙ্কল্পের জলে সেই গর্ত্ত পুরিয়া পুষ্করিণীর সৃষ্টি হইয়াছে।

১৮। নৃসিংহ।

১৯। নীলকণ্ঠ।

২০। মার্কণ্ডেয় সরোবর, এখানে পিণ্ডদান করিতে হয়।

২১। হরিপার্ব্বতী।

২২। মার্কণ্ডেশ্বর।

২৩। চন্দন পুকুর। এখানে বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া হইতে ২১ দিন (একাদশী পর্য্যন্ত) ভগবান মদনমোহন জিউর মূর্ত্তি নৌকায় বসাইয়া ঘোরান হয়, চন্দন যাত্রার সময় এখানে খুব উৎসব হয়।

২৪। কপালমোচন।

২৫। আদ্যাবুকেশ্বর।

২৬। কপোতেশ্বর।

২৭। যমেশ্বর।

২৮। মৃত্যুঞ্জয়।

২৯। বিশ্বেশ্বর।

৩০। বিশ্বেশ্বর।

৩১। গোপীনাথ।

৩২। লোকনাথ। শ্রীজগন্নাথ জিউ হইতে দুই মাইল দূরে, ভগবান রামচন্দ্র স্বহস্তে এই শিবমূর্ত্তির স্থাপনা করিয়াছিলেন।

৩৩। শ্বেতমাধব ভাস্করকূপ দেখিবার উপযুক্ত।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ মাহাত্ম্য।

এক সময় পরম পবিত্র নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি অষ্টাশী হাজার ঋষি একত্রিত হইয়া সুকদেবকে নম্র ভাবে উত্তমোত্তম পবিত্র তীর্থের ও ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলেন। সুকদেব সমস্ত পৃথিবী মণ্ডলের তীর্থ ও ক্ষেত্রের ভিতর পুরুষোত্তম (জগন্নাথ) ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। সুকদেব বলিলেন,—"হে শৌনক! শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে স্বয়ং পরমপুরুষ শ্রীশ্রীনারায়ণ জগন্নাথ নাম ধরিয়া বাস করিতেছেন, এই ক্ষেত্র উড়িষ্যা দেশে ঋষিকুল্যা ও বৈতরণী নদীর মধ্যে দশ যোজন (চল্লিশ ক্রোশ) বিস্তার করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও শান্তি প্রদান করিতেছে। হে মুনিগণ! যাহারা এই স্থানে বৈতরণী নদীতে ও বিন্দু হ্রদে স্নান, গিরিজা দেবী, নীলকণ্ঠ মহাদেবের দর্শন, সূর্য্যক্ষেত্র ও চন্দ্রভাগায় স্নানাদি ও যাত্রা করে, তাহারা ঋষিতুল্য। হে শৌনক! শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শঙ্খাকার শঙ্খোদর স্নান, নীলাচলে রোহিণী কুণ্ডে স্নান ও দান এই স্থানেই কল্পবৃক্ষাদির দর্শন, স্পর্শন ও পূজন ইত্যাদি করিলে যাত্রীর অনেক জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপপুঞ্জ বিনষ্ট হইয়া যায়। এথান হইতে অতি নিকটে পৃথ্বিদেবী আর লক্ষ্মীযুক্ত রত্নসিংহাসনোপরি ভগবান নীলমাধব অবস্থান করিতেছেন। এই স্থান হইতে এক শত হাত দূরে ভগবান মাধব, ব্রহ্মা, নৃসিংহ ভগবান সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। ইঁহাদের দর্শন, পূজন মাত্রেই মানব পাপ মুক্ত হয়। ব্রহ্মহত্যা পাপ নাশ করিবার জন্য কপালমোচন তীর্থ আছে। এই স্থানে নারায়ণ ও শিবলিঙ্গের দর্শন ও পূজা করিলে কোটি শিব পূজার ফল হয়। এই স্থানে বিষ্ণু ভগবান যমশ, চামুণ্ডাদেবী,

লোকপাবনী গঙ্গা, মৎস্য অবতারের মূর্ত্তি ইত্যাদি দর্শন করিলে সমস্ত পাপ নাশ হইয়া যায় এবং বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়; এই তীর্থে স্নান করিবামাত্র কামাদি ষড়রিপুর দমন ও তৎকর্ত্তৃক সমস্ত পাপ নাশ হইয়া যায়। এখান হইতে কিছু দূরে মঙ্গলাদেবী দক্ষিণনাদন গণেশের দর্শন করিলে যাত্রীর সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হয়। কাল পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে মরিচিকা শক্তি বিরূপাক্ষ অর্ব্বশিজাদেবী, কপালমোচন, হরিণশঙ্খ, নীলকণ্ঠ, মঙ্গলামার্কণ্ডেয় জিউ ও মার্কণ্ডের পুকুর আছে, এই পুকুরে স্নান দর্শন পূজা করিলে যাত্রী বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। যেখানে নীলমাধব ভগবান আছেন, সেখানে পৃথিমণ্ডলের সমস্ত তীর্থই আছে এবং সেই স্থানে স্বর্গস্থিত দেবতারা বাস করিতে ইচ্ছা করেন। এই স্থান সেবরীর স্থান হইতে যুক্ত, চৌদ্দভুবনে মান্য করিবার উপযুক্ত অতি পবিত্র ও উত্তম স্থান। এক সময় রোহিণী কুণ্ডে একটী পিপাসার্ত্ত কাক জল পান করিয়া শরীর ত্যাগ করিল, তৎক্ষণাৎ সে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিল। তখন যমরাজা বিষ্ণুকে ইহার মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বিষ্ণুর আজ্ঞা পাইয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মী এই পরম পবিত্র ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিস্তারিত বর্ণন করিলেন এবং যমরাজাকে বলিয়া দিলেন যে এই পাঁচ ক্রোশ তীর্থের ভিতর তোমার কোনও অধিকার নাই। এমন কি যে কোন যাত্রী, এই স্থানে এক পক্ষ কাল বাস করিয়া অন্য দেশে গিয়া শরীর ত্যাগ করে, তাহার উপরও তোমার কোনও অধিকার থাকিবে না। হে যমরাজ! আমি তোমায় সত্য কথা বলিতেছি, হে সূর্য্যপুত্র! জগন্নাথ ক্ষেত্রের সমান কোনও ক্ষেত্র নাই এবং যাঁহারা এখানে বাস করেন, তাঁহাদের মাহাত্ম্য আমি বর্ণন করিতে অসমর্থ। এই কথা শুনিয়া যমরাজ অতি প্রসন্ন মনে নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। শুকদেব মুনি শৌনককে বলিলেন, হে শৌনক! দারুরূপে ভগবান, শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। অতএব ইহা অপেক্ষা পবিত্র স্থান ভূলোকেতে নাই। এখানকার মাহাত্ম্য বর্ণন করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। শৌনক ও ঋষিগণ যাহারা এই অতি পবিত্র মাহাত্ম্য শুনিবে, পড়িবে ও পড়াবে, তাঁহারা নিঃসন্দেহে বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিবে (অং ১)। শৌনক আদি ঋষিগণ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিস্তারিতভাবে কহিতে বলিলেন। তখন শুকদেব অতি প্রসন্নচিত্তে পুনরায় মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন। মালবদেশে সমস্ত গুণযুক্ত অতি তেজস্বী, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বাস করিতেন, একদা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পূজা করিতেছিলেন এমন সমন একটী জটা বল্কলধারী মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রাজা মুনির সৎকার ও পূজা করিলেন; মুনি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে বলিলেন, "রাজন! উড়িষ্যা দেশে সমস্ত তীর্থ দ্বারা ভূষিত নীলাচল পর্ব্বতে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র আছে, সেখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথ জিউ সমস্ত দেবগণের সহিত বিরাজ করিতেছেন। হে রাজন! তুমিও স্বকুটম্বে সেই স্থানেই গিয়া বাস কর। ঋষির আজ্ঞা পাইয়া রাজা পুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রথমে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র দেখিয়া আসিতে পাঠাইলেন। সে জঙ্গলে গিয়া বিশ্ববসু-নামে শবরের সহিত দেখা করিয়া সেখানকার সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া রোহিণী কুণ্ডে স্নান

করিয়া বটবৃক্ষ স্পর্শ করিয়া রত্নসিংহাসন স্থিত নীলতনুধারী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম ও পূজন করিয়া স্তুতি করিলেন। তাহার পর বিশ্ববসুর বাড়ীতে আসিয়া ভগবানের উত্তমোত্তম প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন এবং শবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই ঘোর জঙ্গলে তুমি এই উত্তমোত্তম পদার্থ সকল কোথায় পাইলে? বিশ্ববসু বলিল, হে মিত্র! শ্রীশ্রীজগন্নাথ জিউর দর্শন পূজন করিতে স্বর্গ হইতে দেবতারা আসেন এবং তাঁহারাই এই সকল উত্তমোত্তম পদার্থ ভোগ দিয়া যান। আমি সেই সকল ভোগ-প্রসাদ দ্বারায় যাত্রীদের সৎকার করিয়া থাকি এবং আমিও স্বকুটম্বে ভোজন করি। এই সকল বার্ত্তালাপ করিতে করিতে বিদ্যাপতি ঘুমাইয়া পড়িলেন; তখন ভগবান শ্রীশ্রীজগন্নাথ তাহাকে স্বপ্ন দিলেন যে তুমি যাইয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে স্বকুটুম্বে এখানে নিয়ে এস এবং তুমিও আমার সভায় স্থিত হও। তাহার পর প্রাতঃকালেই বিদ্যাপতি বিশ্ববসুর সহিত দেখা করিয়া নিজ দেশে আসিয়া রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। তখন রাজা নিজ রাজ্যমধ্যে এই বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন যে সমস্ত প্রজাকে রাজার সহিত উড়িয়া দেশে যাইতে হইবে। রাজ-আজ্ঞা পাইয়া সমস্ত প্রজা রাজার সহিত যাইতে উদ্যত হইল, এবং রাজা সমস্ত প্রজাকে সঙ্গে লইয়া উড়িষ্যাদেশে গমন করিলেন। রাস্তায় কৌশিকী নদীর (গঙ্গা ও চক্রতীর্থ একাগ্র বিপিন) মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। রাজন্! এখানে (গঙ্গাসাগর) স্নান করিলে ও বাস করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। ইহা শুনিয়া রাজা অতি আনন্দিত হইলেন। (অং ২) হে সৌনক! ইতিমধ্যে একাগ্রমনে ধ্যানেরত রাজা একটী ঘণ্টার শব্দ শুনিতে পাইলেন, তখন রাজা বিনীতভাবে নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন; নারদ বলিলেন, "হে রাজন্! এক সময় কাশীনবাসী বিশ্বনাথ (মহাদেব) এই বনে তপস্যা করিলেন এবং তপস্যায় নীলমাধব প্রসন্ন হইয়া মহাদেবকে দর্শন দিলেন, মহাদেব বর চাহিলেন যে, আমার নামে এই বন প্রসিদ্ধ হউক। তখন নীলমাধব প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন। সেই অবধি এই স্থান ভুবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং সেই অবধি লিঙ্গেশ্বর মহাদেব এই স্থানে বাস করিতেছেন। নারদের বচন শুনিয়া রাজা বিন্দু সরোবর তড়াগে স্নান করিলেন, এবং কোটি লিঙ্গেশ্বর মহাদেবের দর্শন পূজন করিয়া রাজা নারদের সহিত প্রাতঃকালে কপোত শান্তিতে প্রবেশ করিলেন। কপোতেশ্বর ও বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলে নারদ কহিলেন, রাজন এক সময় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত নীলমাধবের দর্শনের জন্য এখানে উপস্থিত হন, সেই সময় বনের বৃক্ষের সহিত বিশ্বেশ্বর শিবের স্থাপনা করিয়া ঘোর জঙ্গলে মহাপ্রতাপী রাক্ষসদের সংহার করিলেন। সেই সময় হইতে বিশ্বেশ্বর শিব প্রসিদ্ধ হইল। একদা কাশীস্থ শিব নীলমাধবের দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় কপোতের স্থানে আসিলেন, সেই হইতে কপোতেশ্বর শিব প্রসিদ্ধ হইল। ইতিমধ্যে রাজার বাম চক্ষু স্পন্দিত হইল; নারদের নিকট ইহার ফল জিজ্ঞাসা করায় নারদ বলিলেন, অদ্য তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবে, তুমি আজ নীলমাধবের দর্শন পাইবে না। যে সময় তুমি বিদ্যাপতিকে এখানে পাঠিয়েছিলে সেই সময় হইতেই ভগবান অন্তর্ধান হইয়াছেন, স্বর্ণাকৃতি বালী পীতবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ইহা শুনিয়া রাজা অতি দুঃখিত হইলেন। তখন নারদ রাজাকে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন এবং নানা প্রকার ধর্ম্মালাপ করিতে করিতে রাজা নীলমাধবের মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন নারদ বলিলেন রাজন! এখন ভগবান শ্বেতদ্বীপে চলিয়া গিয়াছেন। ইতিমধ্যে আকাশবাণী হইল, হে রাজন! নারদ যাহা তোমায় বলিতেছেন তাহা সত্য, তুমি তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন কর। আকাশবাণী শুনিয়া রাজা অতি প্রসন্ন হইলেন এবং নারদের সহিত ব্রহ্মার স্থাপিত নীলকণ্ঠ মহাদেবের সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানে পাঁচ রাত্রি বাস করিয়া বিশ্বকর্ম্মার দ্বারায় একটী উত্তম মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তাহাতে নৃসিংহ মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। পুনরায় নারদের আজ্ঞানুসারে এক শত অশ্বমেধের সামগ্রীযুক্ত যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ করাইয়া একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। রাজা সাত দিন পর্য্যন্ত অনশনব্রত ধারণ করিয়া যজ্ঞ দ্বারে ছিলেন। তখন ভগবান প্রসন্ন হইয়া চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করিয়া শ্রীলক্ষ্মী ও বলরামের সহিত দর্শন দিলেন। রাজা অনেক স্তুতি করিলেন এবং চক্ষু খুলিবামাত্র কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এই সমস্ত বিষয় রাজা নারদকে বলিলেন, নারদ রাজাকে অনেক উপায়ে সন্তুষ্ট করিলেন। প্রাতঃকালে রাজা নারদের সহিত সমুদ্রস্নানে যাইলেন; এবং স্নান করিয়া যেমন জল হইতে উপরে উঠিলেন, তখনি রাজা সম্মুখে একটী বৃক্ষ ও ভগবান নারায়ণের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। রাজা অতি প্রসন্ন হইয়া স্তুতি ও পূজা করিলেন। দারুরূপ ভগবানকে যজ্ঞশালায় স্থাপিত করিয়া সমস্ত কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিয়া রাজা ভগবানকে সদৈব স্থিত থাকিবার জন্য ভক্তি সহকারে প্রার্থনা করিলেন, দৈববাণী হইল,—"তুমি এখানে ১৫ দিন উৎসব কর, তাহার পর একটী ছুতর আসিবে, তাহাকে মন্দিরের ভিতর বন্ধ করিবে এবং বাহির হইতে তোমরা বাজনা বাজাইয়া কীর্ত্তন করিবে, সে ভিতরে দারুরূপ ভগবানের প্রতিমা প্রস্তুত করিবে" এই দৈববাণী শুনিয়া রাজা অতি প্রসন্ন হইলেন। আকাশবাণী অনুসারে অস্ত্র লইয়া একটী ছুতার উপস্থিত হইল, রাজা ঐ মত ছুতারকে ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া বাহিরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। (আং ৩) সেই সময় দেবতারা আকাশে থাকিয়া নৃত্য, গান ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বলভদ্র ও সুভদ্রার সহিত শ্রীজগন্নাথ দেব মন্দিরে আবির্ভূত হইলেন। মন্দির খোলা হইল, সকলে নারায়ণের দর্শন, পূজা ও স্তুতি করিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রশংসা করিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইহার পর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দিরটী আরও উচ্চ করিয়া নির্ম্মাণ করাইলেন। বিশ্ববসু ও বিদ্যাপতিকে রাখিয়া রাজা নারদের সহিত ব্রহ্মাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য পুষ্পকরথে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। সেখানে গিয়া রাজা ইন্দ্রাদি দেবতাকে দেখিতে পাইলেন। নারদের সহিত রাজা ব্রহ্মার দর্শন পাইয়া অনেক স্তুতি করিলেন। নারদ রাজার অভিপ্রায় ব্রহ্মাকে বুঝাইয়া বলিলেন, দেব! আপনি দারুরূপ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রতিমা নিজ হস্তে স্থাপিত করুন। যে সময় এই সকল কথা হইতেছিল, সেই সময়ে দুর্ব্বাসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দুর্ব্বাসার সৎকার ও প্রতিষ্ঠা হইবার পর, তিনিও এবিষয়ের জন্য ব্রহ্মার নিকট অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মা সম্মত হইলেন এবং সকল দেবতাকে শ্রীজগন্নাথ দেবের প্রতিষ্ঠার

জন্য সেখানে যাইতে বলিলেন ; "দেবগণ ! তোমরা সকলে ঐ স্থানে আসিও আমিও যাইব" ব্রহ্মা রাজাকে বলিলেন, "তোমার সমস্ত সামগ্রী সেখানে নষ্ট হইয়াছে কারণ, তুমি এখানে আসিয়াছ আজ কয়েকটী মন্বন্তর হইয়া গিয়াছে, সেখানে কেবল মন্দির ও মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে আর কিছুই নাই ; তুমি নারদ, শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধিকে সঙ্গে লইয়া যাও এবং সকল সামগ্রী জোগাড় কর, আমি পরে আসিয়া দেব প্রতিষ্ঠা করিব।" রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই মত আজ্ঞা পাইয়া হৃষ্টচিত্তে চলিয়া আসিলেন। (অং ৪) ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া রাজা মন্দিরের নিকট সকলের সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে স্থাপিত দেখিলেন। ক্রোধে রাজা তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বদ্বার দিয়া মূর্ত্তি বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ মূর্ত্তি স্থাপিত করিল ?" উত্তরে জানিতে পারিলেন, গালব রাজা মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করিয়া ঐ মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। এই শুনিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন গালবের উপর আক্রমণ করিলেন। গালবও আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন নারদ গালব রাজাকে ইন্দ্রদ্যুম্নের সকল বৃত্তান্ত শুনাইলেন। তখন গালব রাজা লজ্জিত হইয়া নিজ রাজ্য দিয়া ইন্দ্রদ্যুম্নের পিছনে গিয়া বসিল। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির উত্তমরূপে পরিষ্কার করাইলেন, এবং তিনটী রথ তৈয়ার করাইয়া ব্রহ্মার ধ্যান করিলেন। হংসস্থিত ব্রহ্মা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; সমস্ত সামগ্রী দেখিয়া প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। রত্নবেদীর উপর ভগবানকে স্থাপিত করিয়া, সুদর্শন আদিকে স্থিত করিয়া ভগবানের স্তুতি করিলেন ও জয় শব্দ প্রতিধ্বনিত করিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে ধন্যবাদ দিলেন। (অং ৫) শুকদেব শৌনককে বলিলেন, হে শৌনক ! **বৈশাখী শুক্লা অষ্টমী বৃহস্পতিবার পুষ্যানক্ষত্রে** ব্রহ্মা দারুময় ভগবানের প্রতিষ্ঠা করিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। দারুময় শ্রীজগন্নাথদেব অতি প্রসন্ন হইয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন, "আমি তোমায় নিজ ভক্তি (যাহা কেহ সহজে পায় না) দিতেছি। আমি এখানে ব্রহ্মার দ্বিপ্রহরের অন্ত পর্য্যন্ত বাস করিব। আমি অজন্মা তথাপি আমার জন্ম দিন জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা পৌর্ণমাসির দিন হইবে। ঐ তিথি হইতে ১৫ দিন পর্য্যন্ত আমার মন্দির বন্ধ রাখিবে। আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়ার দিন রথোৎসব করিবে। আষাঢ় শুক্লা একাদশীর দিন আমার শয়ন। শ্রাবণ শুক্লা পৌর্ণমাসির দিন আমার বার উৎসব হইবে, কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশীতে উত্থান, মাঘ মাসের শুক্লা অষ্টমীতে আমার শৃঙ্গার ; পৌষ মাসের চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমার দিন আমার পুষ্যাভিষেক যাত্রা, বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে ফাল্গুন মাসের শুক্ল পূর্ণিমার দিন আমার দোলোৎসব, চৈত্র মাসের শুক্লা তৃতীয়াতে চন্দন-যাত্রা করাইবে। হে রাজন ! এই প্রকারে তুমি আমার বার মাসের বার উৎসব করাইবে।" হে শৌনক ! শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এই সকল বাক্য শুনিয়া সকলে পুনরায় ভগবানের স্তুতি করিলেন এবং স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন (অং ৬) শুকদেব বলিলেন, শৌনক ! স্ত্রীরা রোহিণী কুণ্ডে স্নান করিয়া অক্ষয় বট নীলচক্র, বিঘ্নেশ-গণেশ, নৃসিংহ, বিমলাদেবী, ইত্যাদি দেবতাদিগের প্রার্থনা করিয়া পাতালেশ্বর, জয় ও বিজয়কে নমস্কার করিয়া সুস্থচিত্ত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাদেবীর

দর্শন ও পূজা করিবে। হে শৌনক! যাহারা এই প্রকারে বিষ্ণু ভগবানের দর্শন ও পূজা করিবে তাহারা পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে। এই ক্ষেত্রের ন্যায় আর কোনও ক্ষেত্র নাই (অং ৭) শুকদেব পুনরায় বলিলেন, হে শৌনক! শ্বেত গঙ্গায় স্নান করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথপুরীতে তিন দিন অবশ্য বাস করিবে। শ্বেত গঙ্গায় স্নান করিয়া সেই স্থানে যে সকল দেবতারা আছেন, তাঁহাদের দর্শন করিবে। রাস্তায় সাক্ষী-গোপাল দর্শন করিবে, তাহার পর বাড়ীতে ফিরিয়া হবন (হোম) করিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। এই প্রকারে যাত্রা করিলে পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ ভক্ষণ করিলে কোটি কোটি কপিলা গাভী দানের ফল হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ বা মালা স্পর্শ করিলেও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। কেবলমাত্র প্রসাদ ভোজন করিলেই শ্রীশ্রীজগন্নাথ পুরীতে সকল স্থানে যাইবার ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব কোনও প্রকার বিকার বা দ্বিধা না করিয়া শ্রীজগদীশের প্রসাদ ভক্ষণ করিবে। কদাচ অনাদর করিবে না। এমন কি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য যে কেহ পড়িবে, পড়াইবে, শুনিবে ও শুনাইবে অথবা শ্রীজগন্নাথ মাহাত্ম্য পুস্তক যে ব্রাহ্মণকে দান করিবে সে ঘরে বসিয়া শ্রীশ্রীজগদীশের দর্শনের ফল প্রাপ্ত হইবে। শৌনক ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ও নারদের সহিত সশরীরে ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন। আর আমিও এই স্থানে এই পুণ্য কথা সমাপ্ত করিতেছি। তখন শৌনকাদি ঋষিগণ শুকদেবকে পূজা করিলেন এবং ধন্য ধন্য বলিয়া মাহাত্ম্য কথা সমাপ্ত করিলেন।

মাদ্রাজ

মাদ্রাজ সহর মাদ্রাজ প্রান্তের রাজধানী। ইহা সমুদ্রের ধারে অবস্থিত ও ইহা অতি মনোহর স্থান। ইহা ভারতের তৃতীয় সহর। এই বিষয় লেখা বিড়ম্বনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিখ্যাত সহরের বিস্তৃত বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এই পুস্তিকা কেবল তীর্থ স্থানের যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিবে। অতএব এ বিষয় আলোচনা করা ধৃষ্টতা বই আর কিছুই নহে। তত্রাচ এই বিখ্যাত নগরের কয়েকটী প্রধান (দেখিবার যোগ্য) স্থান নিম্নে লিখিয়া দিতে বাধ্য হইলাম।

(১) সেণ্ট জর্জের কেল্লা (এখানে টিপুসুল্‌তানের কামান দেখিবার যোগ্য)

(২) গবর্ণমেণ্ট হাউস (Government House)

(৩) হাইকোর্ট (High Court)

(৪) যাদুঘর (Musium)

(৫) নেপিয়ার পার্ক

(৬) পুর বাজার

(৭) বোটানিকাল গার্ডেন (Botanical Garden)

(৮) পার্থরথীর মন্দির

(৯) রবিন্‌সন্স পার্ক (Robinsons Park)

(১০) সপ্তকূপ

(১১) মেমোরিয়াল হল (Memorial Hall)

(১২) অব্‌জার ভেটারী (Observatory)

(১৩) থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটী (Theosophical Society)

(১৪) এফারিয়াম্‌ (সামুদ্রিক জীববাস) ইহা দেখিবার জন্য প্রত্যেককে ⁄॰ এক আনা করিয়া টিকিট লাগে।

(১৫) কাল হস্তী
(১৬) তৃপতি (বালাজী)
(১৭) তিরুমান্নামলেয়
} এই তিনটী তীর্থ স্থানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে।—

(১৮) পংছীতীর্থ চিঙ্গুলপুত জংসন হইতে ৭ মাইল। এখানে ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদি পাওয়া যায় মুছালিয়ারের ধর্ম্মশালা, পোল্‌ট্রীতে থাকিবার বিশেষ সুবিধা আছে।

কাঞ্জিওয়ারাম (কাঞ্চী)

সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের (South Indian Railway) চিঙ্গলীপুর জংসন হইতে চিঙ্গলীপুর আর্কো নামে একটী ব্রাঞ্চ লাইন গিয়াছে; কাঞ্জিওয়ারাম এই ব্রাঞ্চ লাইনের একটী ষ্টেশন। ইহা মাদ্রাজ প্রান্তের চিঙ্গলীপুরের অন্তর্গত। ভারতবর্ষের সাতটী মহাতীর্থের ভিতর কাঞ্চি অন্যতম। লোকে ইহাকে দক্ষিণ দেশের কাশী বলিয়া থাকে। এখানে মৃত্যু হইলে মোক্ষ হয়, সেই জন্য কাশীর ন্যায় লোকে মৃত্যুর পূর্ব্বে এখানে আসে ও মৃত্যু কামনা করিয়া বাস করে। কাঞ্চিতে পাথরের অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে, ইহা শিল্পকলার বিশেষ পরিচায়ক। শিবকাঞ্চি ও বিষ্ণুকাঞ্চি দুইটী পৃথক স্থান। শিব কাঞ্চিতে একাগ্রনাথ নামে একটী শিব মন্দির আছে, ইহাতে অনেকগুলি মণ্ডপ আছে। ইহার সহস্র স্তম্ভ সংযুক্ত সভামণ্ডপের শোভা অবর্ণনীয়। একাগ্রনাথ মহাদেব এই মন্দিরের সম্মুখে আছেন। একটী পুরাতন গাছের তলায় পার্ব্বতী বালীর শিব গড়িয়া পূজা করিয়াছিলেন, সেই জন্য শিবের নাম হইয়াছে একাগ্রনাথ।

কামাখ্যা দেবী, কচ্ছমেশ্বর মহাদেব, কৈলাশনাথ, ত্রিবিক্রম, শঙ্করাচার্য্যের পাষাণ মূর্ত্তি প্রভৃতি আরও অনেক পবিত্র সমাধী শিবকাঞ্চি হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। বিষ্ণু মন্দিরের শোভা দেখিবার উপযুক্ত, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এখানে বরদরাজ স্বামীর মূর্ত্তি, নরসিংহ স্বামী, বেগবতীধারা ইত্যাদি স্থান দেখিবার উপযুক্ত। ষ্টেশন হইতে তীর্থস্থান প্রায় দুই মাইল দূরে। এখানেও ধর্ম্মশালা আছে।

তাঞ্জোর

ইহা সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের একটী ষ্টেশন। তীর্থস্থান ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ধর্ম্মশালা, ক্ষেত্র (ছত্র) ও হোটেল আছে। যাত্রীদের থাকিবার বিশেষ সুবিধা আছে। ইহা একটী অতি পুরাতন ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগরী। তৎকালীক শিল্প ও শিল্পা

তাহা দেখিয়া পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতিই চমৎকৃত হইয়াছে।

ব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সমস্ত ভূমণ্ডলে বিখ্যাত। এই মন্দির প্রায়

হৎ বৃষভের (ষাঁড়ের) মূর্ত্তি, সুব্রহ্মণ্য ও প্রাইংস্তব্রের মন্দিরও

ত্রিচিনা পল্লী

ইহা সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের একটী ষ্টেশন। ইহা কাবেরী নদীর ধারে অবস্থিত। স্থানেও ধর্ম্মশালা, ক্ষেত্র (ছত্র) ও হোটেল ইত্যাদি আছে। এখানে প্রায় ২০০ দুইশত ফিট উচ্চ পাহাড়ের উপর শিব ও গনেশের মন্দির আছে। পাহাড়ের উপর হইতে কাবেরী নদী, শ্রীরঙ্গমের মন্দির এবং উন্নত গোপুরাম ইত্যাদির শোভা দেখিতে অতি মনোহর। শ্রীরঙ্গম জীউর মন্দির এস্থান হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। মন্দিরে সাতটী গোপুরাম আছে। মন্দিরটী সাতটী পাঁচিল দিয়া ঘেরা। এই প্রাচীরগুলিকে অতিক্রম করিয়া মন্দিরের ভিতর শেষনাগের (বাসুকীর) উপর ভগবান বিষ্ণুর বৃহৎ মূর্ত্তির দর্শন হয়। মন্দিরের ভিতরে অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে। শ্রীরঙ্গম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে জম্বুকেশ্বর মহাদেবের মন্দির দেখিবার উপযুক্ত।

মদুরা

মদুরা সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের একটী প্রধান (জংসন) ষ্টেশন। এই নগর মইগাই নদীর দক্ষিণ ধারে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে প্রাচীন দেব মন্দির আছে। মীনাক্ষী দেবী ও সুন্দরেশ্বর মহাদেবের মন্দির দেখিবার উপযুক্ত। মন্দিরটী খুব বড় প্রায় এক সহস্র ফিট লম্বা ও আট শত ফিট চওড়া এবং একশত সত্তর ফিট উচ্চ। ইহাতে নয়টী উচ্চ গোপুরাম আছে। মন্দিরের বাহিরের দেয়ালে পৌরাণিক কথা ও দেব-দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। মদুরার মন্দিরের শিলা-চিত্র-কলা ভারতবর্ষের ভিতর অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রবাদ আছে বনবাস কালে শ্রীরামচন্দ্র এই স্থানে সুন্দরেশ্বর মহাদেবের পূজা করিয়া ছিলেন।

(১) মীনাক্ষী দেবী।

(২) অষ্টলক্ষ্মী মণ্ডপ।

(৩) শত স্তম্ভ মণ্ডপ।

(৪) পাণ্ডু মণ্ডপ।

(৫) বসন্ত মণ্ডপ।

(৬) সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপ।

(৭) তেপ্যাকুলীম পুষ্করিণী।

(৮) বৃহৎ বট বৃক্ষ ইত্যাদি দেখিবার উপযুক্ত।

(১) দর্ম্ভশয়ন
(২) নবপাষাণ
(৩) রামনদ

} ইহা ষ্টেশন হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। এখানে যাইবার জন্য বয়েল গাড়ী পাওয়া যায়। এখানে ধর্ম্মশালা ক্ষেত্র (ছত্র) ও ডাক বাঙ্গলা আছে।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর

এই তীর্থ মাদ্রাজ প্রান্তের অন্তর্গত, মদুরা জেলার রাজা রামানন্দের জমিদারীর ভিতর। রেল তীর্থস্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে। রামেশ্বর তীর্থ একটী ছোট দ্বীপ ইহার দৈর্ঘ্য ১২ বার মাইল প্রস্থ ৭।৮ মাইল হইবে। রামেশ্বর তীর্থের উৎপত্তির কারণ রামায়ণে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে অতএব এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার ভিতর এ বিষয় লইয়া আলোচনা করা বৃথা। সকলেই জানেন যে শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারায় এই তীর্থের নির্ম্মাণ হইয়াছে। তথাচ আমার সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাগণকে এ বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। শিবের মন্দিরটী প্রায় ১০০০ ফিট লম্বা, ৬৫০ ফিট চওড়া এবং ১২৫ ফিট উচ্চ, ইহার চতুর্দ্দিকে চিত্রাঙ্কিত। সভামণ্ডপের শোভা অতুলনীয়। মন্দিরের ভিতর শ্রীরামচন্দ্রের স্বহস্ত নির্ম্মিত মৃণ্ময় শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। সেই শিবলিঙ্গের দর্শন করিলে মনুষ্য মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। এখানকার মূর্ত্তি কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। যাত্রীদের দূর হইতে দর্শন করিতে হয়। এখানকার পূজারী যাত্রীদের নিকট হইতে পূজার সামগ্রী লইয়া পূজা করিয়া দেয়। মন্দিরের ভিতর একুশটী কূপ আছে, ইহার ভিতর সমস্ত তীর্থের জল আছে। প্রবাদ আছে যে শ্রীরামচন্দ্র নিজের অমোঘ বাণ দ্বারায় এই কূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন তীর্থের জল এই কূপগুলিতে আনিয়াছিলেন। গঙ্গা, যমুনা, গয়াশঙ্খ, চক্র, গজ-[illegible], কুমুদ আদি তীর্থ কূপের জল স্পর্শ করিয়া যাত্রীরা পবিত্র হইয়া থাকেন।

(১) কাশী বিশ্বনাথ—শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে শিবলিঙ্গ আনিতে কৈলাশে পাঠাইয়াছিলেন। হনুমানের ফিরিতে দেরী হইলে পর শ্রীরামচন্দ্র বালীর শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলেন। ইহার পর হনুমান কৈলাশ হইতে এই (কাশী-বিশ্বনাথ) শিবলিঙ্গ আনিয়াছিলেন।

(২) লক্ষ্মণ তীর্থ—এখানে পিণ্ডদান করিতে হয়।

(৩) রাম তীর্থ।

(৪) গন্ধমাদন পর্ব্বত বা রাম ঝরোখা, এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা আছে।

(৫) অমৃত বটিকা।

(৬) হনুমান কুণ্ড।

(৭) ব্রহ্মহত্যা তীর্থ।

(৮) বিভীষণ তীর্থ।

(৯) মাধব কুণ্ড।

(১০) সেতু মাধব।

(১১) রামেশ্বর জিউ।

(১২) রামেশ্বরী দেবী।

(১৩) নন্দিকেশ্বর।

(১৪) অষ্ট-লক্ষ্মী মণ্ডপ।

বিনায়ক আদি আরও কয়েকটী তীর্থ আছে ইহা পরে বর্ণিত হইবে। রামেশ্বর হইতে ১২ মাইল দূরে ধনুষ কোটী তীর্থ অবস্থিত। তীর্থস্থান পর্য্যন্ত রেললাইন গিয়াছে। এই তীর্থে শ্রাদ্ধাদি করা হয়। এখানে সোনার ধনুক দান করিলে হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়।

ধর্ম্মশালা—এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে।

প্রধান ধর্ম্মশালা—বংশীলাল অবীরচাঁদ ডাকা, রাজা শিববকস বাগলা ও ভগবানদাস বাগলা নামক এই তিনটী ধর্ম্মশালাই প্রধান।

সেতু বাঁধিবার বর্ণনা, সেতুর মধ্যে প্রধান ২৪টী তীর্থের নাম।

শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা পাইয়া নল বলিলেন "আমি বিশ্বকর্ম্মার ঔরস পুত্র এবং আমিও বিশ্বকর্ম্মার সমান। আপনার আজ্ঞা পাইলে আমি এখনই সেতু তৈয়ার করিয়া দিব। নলের এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র বানরদিগকে আজ্ঞা করিলেন এবং

তাহারাও মূহুর্ত্তের ভিতর বড় বড় পর্ব্বত, বৃক্ষ, প্রস্তরাদি লইয়া আসিল। এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমুদ্রের উপর ১০০ যোজন লম্বা এবং ১০ যোজন চওড়া সেতু বাঁধিয়া ফেলিল।

এই সেতু দর্শনের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে এবং ইহা দর্শনে মহাপাপ বিনষ্ট হয় ও মহাদেব অত্যন্ত প্রীত হন। সেতু-স্নানের বিশেষ ফললাভ হয়। সেতু নির্ম্মাণের সময় শ্রীরামচন্দ্র যেস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন ও কুশ-শয্যায় শুইয়াছিলেন ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ। এখানে ২৪টী তীর্থ প্রধান।

(১) চক্রতীর্থ।
(২) বেতালবরদ।
(৩) পাপবিনাশন।
(৪) সীতাসর।
(৫) মঙ্গলতীর্থ।
(৬) অমৃত বাপিকা।
(৭) ব্রহ্মকুণ্ড।
(৮) হনুমানকুণ্ড।
(৯) অগস্ত্যতীর্থ।
(১০) রামতীর্থ।
(১১) লক্ষণতীর্থ।
(১২) জটাতীর্থ।
(১৩) লক্ষ্মীতীর্থ।
(১৪) অগ্নিতীর্থ।
(১৫) শক্রতীর্থ।
(১৬) শিবতীর্থ।
(১৭) শঙ্খতীর্থ।
(১৮) যমুনাতীর্থ।
(১৯) গঙ্গাতীর্থ।
(২০) গয়াতীর্থ।
(২১) কোটিতীর্থ।
(২২) সাধ্যামৃত তীর্থ।
(২৩) মানসতীর্থ
(২৪) ধনুষ্কোটি তীর্থ।

উপরোক্ত এই ২৪টী তীর্থই সেতুর নিকটে আছে। ইহারা মহাপাপ হরণ করে।

মাহাত্ম্য।

লোভে, ভয়ে অথবা সংসর্গে যে একবার সেতুর দর্শন, শ্রবণ অথবা পূজা করে, সে কখনও দুঃখ পায় না এবং সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। রামেশ্বরের আট প্রকার ভক্তি আছে যথা :—

(১) রামেশ্বরের ভক্তদের মধ্যে আপোষে স্নেহ বাড়ান।
(২) পূজা দেখিয়া প্রসন্ন হওয়া।
(৩) নিজে পূজা করা।
(৪) রামেশ্বরের অর্থ বৃদ্ধির জন্য শারিরীক চেষ্টা করা।
(৫) ভক্তিযুক্ত হইয়া রামেশ্বরের কথা শ্রবণ করা।
(৬) রামেশ্বরকে স্মরণ করিবামাত্র রোমাঞ্চ হওয়া এবং প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করা।
(৭) দিবারাত্র সকল সময়ে রামেশ্বরকে স্মরণ করিতে থাকা।
(৮) উঁহারই আশ্রয়ে জীবন ধারণ করা।

এই আট প্রকারের ভক্তি যদি ম্লেচ্ছের ভিতর থাকে, তাহলেও সে মুক্তি পাইবার অধিকারী হয়। বেদান্তজ্ঞানী, অনন্যভক্তি ব্রহ্মজ্ঞানী, জিতেন্দ্রিয় মুনিশ্বরেরা সে মুক্তি পাইয়া থাকেন। রামেশ্বরের দর্শন মাত্রে জ্ঞানহীন, বৈরাগ্যহীন, ব্যক্তি, সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের মনুষ্য সেই মুক্তি প্রাপ্ত হয়। কৃমি-কীট, দেবতা, মনুষ্য, মহান্ তপস্বী মুনি, রামেশ্বরের দর্শনে তুল্য গতি প্রাপ্ত হয়। রামেশ্বরের দর্শন করিবার পর পাপী ও পুণ্যবান একই পুণ্যের অধিকারী হয়। যে ভক্তিপূর্ব্বক রামেশ্বরের দর্শন করে, সে ভক্তিহীন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ। রামেশ্বরের ভক্ত চণ্ডাল হইলেও বেদবেত্তা, ভক্তিহীন ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করিয়া সমস্ত দান ভক্ত চণ্ডালকেই দেওয়া উচিত। রামেশ্বরের দর্শন করিলে যোগিশ্বরের উর্দ্ধরেতা তুল্য গতি লাভ হয়। যে রামেশ্বরের যাত্রা করে, তাহার পদেপদে অশ্বমেধের ফল হয়। যে রামেশ্বরে এক গ্রাস মাত্র অন্ন ব্রাহ্মণকে দান করে, সে সপ্তদ্বিপা পৃথিবী দানের ফল প্রাপ্ত হয়। রামনাথকে যে ভক্তি পূর্ব্বক বিল্বপত্র, পুষ্প, ফল, জল অর্পণ করে, রামনাথ মহাদেব তাহাকে সর্ব্ব বিপদ হইতে রক্ষা করেন, এই বাক্যের কিছুমাত্র অন্যথা হয় না।

সেতুবন্ধের বৈভব বর্ণন ও গুণনিধি রাজা ও লক্ষ্মীর কথা।

ভগবান বিষ্ণু গরুড়ের উপর আরোহণ করিয়া লক্ষ্মীর অনুসন্ধানে দেশদেশান্তরে পর্য্যটন করিলেন। কিন্তু কোথাও লক্ষ্মীর দর্শন পাইলেন না। খুঁজিতে খুঁজিতে রামসেতুতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সেই কন্যা নিজ সখিদের সহিত বাগানে ফুল তুলিতে আসিয়াছে। ভগবান বিষ্ণুও ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া গঙ্গাজলের কাঁবর (পাত্র) স্কন্ধে লইয়া রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়া, বিভূতি মাখিয়া শিবের নাম করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কন্যাকে ভাল করিয়া দেখিলেন, কন্যাও তাঁহাকে দেখিবামাত্র স্তব্ধ হইল। ব্রাহ্মণ রূপধারী বিষ্ণু কন্যার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন। হাত ধরিবামাত্র কন্যা চিৎকার করিয়া উঠিল। চিৎকারের শব্দ শুনিয়া রাজা স্বসব্যেস্তে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কন্যাকে তাহার চিৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কন্যা বলিল, "পিতা এই ব্রাহ্মণ আমায় স্পর্শ করিয়াছে, আমার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছে এবং নির্ভয়ে পায়ের নিকটে বসিয়া আছে।" ব্যাপার শুনিয়া রাজা ব্রাহ্মণের হাতে হাতকড়ি দিয়া রামনামের মণ্ডপে বন্দি করিয়া রাখিলেন এবং কন্যাকে আশ্বস্ত করিয়া সঙ্গে করিয়া রাজভবনে লইয়া গেলেন। রাত্রিকালে রাজা স্বপ্নে দেখিলেন ঐ ব্রাহ্মণ শঙ্খ, চক্র গদাপদ্ম ও কৌস্তভ মনি, পীতাম্বর ও বিভিন্ন প্রকারের ভূষণ পরিধান করিয়া অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। নারদ ও গরুড়াদি কিঙ্করগণ সেবায় নিরত; নিজ কন্যা কমলের উপর বসিয়া হাতে কমল লইয়া স্নুবর্ণ কমলের মালা ও বিভিন্ন প্রকারের রত্নমণ্ডিত ভূষণ দ্বারায় অলঙ্কৃত হইয়া বসিয়া আছেন এবং দেবগণ

অভিষেক করিতেছেন। প্রভাত হইবামাত্র রাজা নিজ কন্যাকে সঙ্গে লইয়া যে স্থানে ব্রাহ্মণকে বন্দি করা হইয়াছিল সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণকে সেই মূর্ত্তিতে দর্শন করিলেন এবং নিজ কন্যাকেও সেই প্রকার দেখিলেন, যে মত পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তখন রাজা সেই ব্রাহ্মণকে স্বয়ং বিষ্ণু জ্ঞানে স্তুতি করিতে লাগিলেন। ভগবান আমি বড় অপরাধি, আমি না বুঝিয়া আপনার হাত পা লোহার শিকল দিয়া বাঁধিয়াছি এবং আপনাকে কষ্ট দিয়াছি। কিন্তু প্রভো! আমি অজ্ঞান বশতঃ এমত করিয়াছি, অতএব আপনি আমায় ক্ষমা করুন, এই সমস্ত জগৎ আপনার পুত্র ও আপনি সকলের পিতা, প্রতিপালক, অতএব ভগবান আপনি আমায় ক্ষমা করুন। রাজার অতি কাতর বচন শুনিয়া ভগবান শ্রীবিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—"রাজন্ ভয় করিও না; আমি সর্ব্বদাই ভক্তের অধীন। আমায় প্রসন্ন করিবার জন্য তুমি অনেক যজ্ঞ করিয়াছ, তুমি আমার ভক্ত এবং আমি তোমার বশে, ভক্তের শত অপরাধ আমি সর্ব্বদা ক্ষমা করি। তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য লক্ষ্মীকে আমিই পাঠাইয়া দেই। তুমি লক্ষ্মীকে রক্ষা করিয়াছ, সে জন্য আমি তোমার উপর প্রসন্ন। লক্ষ্মী আমার স্বরূপ, যে লক্ষ্মীর ভজনা করে সে আমারও ভক্ত। লক্ষ্মী যাহাকে বিমুখ হন সে আমারও কোপভাজন হয়। তুমি লক্ষ্মীকে রক্ষা করিয়াছ, এজন্য তুমি আমার ভক্ত। তুমি লক্ষ্মীকে রক্ষা করিবার জন্য আমার পায়ে বেড়ী দিয়াছ সে জন্য আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব আমি তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিতেছি, তোমার কোন চিন্তা নাই।

মাদ্রাজ প্রান্তের তীর্থস্থান

(১) সীমাচল—এই স্থান ওয়াল্টেয়ার (waltiar) হইতে সাত মাইল দূরে।
(২) গোদাবরী তীর্থ—এম্ এণ্ড এস্ এম্ (M. & S. M. Ry.) রেলওয়ের একটী ষ্টেশন।
(৩) মঙ্গলগিরি তীর্থ—বেজওয়াড়া হইতে যাইতে হয়।

(৪) কালা হস্তী—
(৫) ত্রিপতি—
(৬) বালাজিউ—
} এম্, এণ্ড এস্, এম্, রেলের ষ্টেশন।

(৭) তিরুভন্নামালয়—
(৮) পক্ষীতীর্থ—
} এই স্থান চিঙ্গলপুর জংসন হইতে ৭ মাইল দূরে।

(৯) কঞ্জিওয়ারাম—
(১০) চিদাম্বর—
(১১) চিকোপুর—
(১২) মায়াওয়ারাম—
(১৩) কামাকুয়াম—

(১৪) টেঞ্জার—

(১৫) ত্রিচিনাপলী—

(১৬) মদুরা—

(১৭) রামেশ্বর—

(১৮) পাপনাশন—এই স্থান আম্বসমুদ্র ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে।

(১৯) ত্রিকুটালম—এই স্থান তিনকাটী ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে।

(২০) ট্রেবেনকোর—এখানে অনন্ত সেনের মন্দির দেখিবার উপযুক্ত।

(২১) সুব্রহ্মণ্য—
(২২) গোকরণ—
(২৩) উরদী—
(২৪) ধর্ম্মস্থল—
} মাঙ্গোলোর ষ্টেশন হইতে ২৫ মাইল দূরে।

এই সকল তীর্থে ধর্ম্মশালা আছে এবং ঘোড়ারগাড়ী পাওয়া যায়।

দ্বারকা।

এই তীর্থ বোম্বাই প্রদেশের কাঠিয়াওয়াড়ার অন্তর্গত জামনগর লাইন দিয়া দ্বারকা যাইতে হয়। ষ্টেশনের নাম দ্বারকা ভাওনগর, জুনাগড় পোরবন্দরের লাইন হইয়া জামনগর ষ্টেশন দিয়া যাইলে রাস্তা সোজা হয়। দ্বারকায় যাইতে হইলে জামনগর ষ্টেশন হইতেই গাড়ী পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা স্থাপিত ও বিশ্বকর্ম্মার দ্বারায় নির্ম্মিত দ্বারকা নগরী এমন সুন্দর যে জিহ্বার দ্বারায় বর্ণনা করা যাইতে পারে না। মথুরা ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত যাদবের সহিত দ্বারকায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। প্রমাণ এই যে দ্বারকা সুন্দর না হইলে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কখনই মথুরা ছাড়িয়া এখানে বাস করিতেন না। দ্বারকায় গোমতীর কুলে চক্রতীর্থে স্নান করিলে বিশেষ ফল আছে, কিন্তু স্নান করিবার পূর্ব্বে দুই টাকা রাজকর মহারাজ বরোদাকে দিতে হয়। এই কর দিবার পর যাত্রীদের হাতে চন্দনের ছাপ দেয়। সেই ছাপ দেখিয়া রাজ-কর্ম্মচারীরা তীর্থে স্নান করিতে দেয়, স্নান করিবার পর মন্দিরের ভিতর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারী দ্বারকানাথ (রণ ছোড় জিউ) এবং তাহার বাম পার্শ্বে রুক্মিণী দেবীর দর্শন করিতে হয়।

(১) গোমতী।
(২) শ্রীসঙ্গম।
(৩) নারায়ণ জিউ।
(৪) দত্তাত্রেয় আশ্রম।
(৫) কুশেশ্বর।
(৬) জাম্বুমান।
(৭) পুরুষোত্তম।
(৮) বলদেব।
(৯) বেণীমাধব।
(১০) শঙ্করাচার্য্যের মন্দির।
(১১) সত্যভামা দেবী।
(১২) লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ

ইত্যাদি এই সকল স্থান দেখিবার উপযুক্ত। এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে।

ভেট-দ্বারকা—ইহা একটী ছোট দ্বীপ। দ্বারকা হইতে সাত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। "রামরায়" পর্য্যন্ত বএল গাড়ীতে যাইতে হয়, তাহার পর চারি মাইল নৌকায় যাইতে হয়। এখানে ভেটজিউ, রণছোড়জিউ, মিরাবাইয়ের কৃষ্ণ মন্দির; শঙ্খেশ্বর স্বামী, রুক্মিণী দেবী ইত্যাদি দেখিবার উপযুক্ত। করস্বরূপ ১৲ এক টাকা বরোদা সরকারে দিতে হয়। থাকিবার ও খাইবার জন্য কোনও কষ্ট হয় না। এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে। ডাকঘর (Post office) বাজার সবই আছে।

গোপী পুকুর—এই স্থান "রামরায়" হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের বিয়োগে গোপীগণ এই স্থানে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। সেই হইতেই গোপীপুকুর নামে বিখ্যাত। এখানে কল্পবৃক্ষ, সত্যভামা, এবং গোপীনাথজিউর মন্দির আছে।

সুদামা পুরী

এই পুরী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পরম ভক্ত, সখা সুদামার নামে প্রসিদ্ধ। পোর বন্দর হইতে শ্রীসুদামা জিউর মন্দির প্রায় দেড় মাইল দূরে। বন্দর হইতে গাড়ী পাওয়া যায়। ষ্টেশনের নিকটে ধর্ম্মশালাও আছে। এই স্থানে মহাত্মা গান্ধী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পোর বন্দরে আসিতে হইলে জাটলেশ্বর দিয়া আসিতে হয়।

গিরনার

ইহা বোম্বাই প্রান্তের কাঠিয়াওয়াড় জেলায় অবস্থিত। জাটলেশ্বর জংসন হইতে জুনাগড় দিয়া এখানে আসিতে হয়। উক্ত রাস্তা দিয়াই গিরনার যাওয়া সুবিধাজনক। এই পর্ব্বত প্রায় ৪০০০ ফিট উচ্চ। পাহাড়ে উঠিবার জন্য সুন্দর সিঁড়ি আছে।

নিম্নলিখিত তীর্থ সকল পাহাড়ের উপর অবস্থিত আছে :—

(১) অম্বামাতা (গিরিনার দেবী)
(২) নিমাইনাথ
(৩) গোরক্ষনাথ
(৪) অঘোর শঙ্কর
(৫) কালিকা শৃঙ্গ।
(৬) বাণগঙ্গা।
(৭) গুরু দত্তাত্রেয়।

উক্ত দেবস্থানগুলি দেখিবার উপযুক্ত। এই স্থানে বলীরাজার রাজধানী ছিল। ভগবান বলীরাজাকে ছলনা করিবার জন্য বামনরূপ ধারণ করিয়া বলীরাজার নিকট হইতে ত্রিপাদ ভূমি চাহিয়াছিলেন এবং তাহার মস্তকোপরি নিজ চরণ রাখিয়া পাতালে পাঠাইয়াছিলেন। এই স্থান জৈনদেরও তীর্থস্থান। পাহাড়ের নীচে একটী পাথরের উপর সম্রাট অশোকের শিল্প লেখা এখনও বর্ত্তমান আছে।

প্রভাষ তীর্থ

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রভাস তীর্থের বর্ণনা অসম্ভব। এই তীর্থের মাহাত্ম্য অনেক কিন্তু এই পুস্তকে যথা সাধ্য সংক্ষেপে লিখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইল। এই তীর্থে যাইতে হইলে, প্রথমে জুনাগড় রেলওয়ের "ভেরাওয়াল" ষ্টেশন হইয়া যাইতে হয়। ভেরাওয়াল হইতে তীর্থ প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। ভেরাওয়ালে সকল প্রকার গাড়ী পাওয়া যায়। এখানে ট্রামওয়ে (Tramway) আছে। যাত্রীদের থাকিবার জন্য পুণ্যাত্মাগণ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। পাণ্ডারাও যাত্রীদের থাকিবার জন্য ব্যবস্থা করে। এখানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতি আজও বর্ত্তমান আছে। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ লীলা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতেই দেশের উত্থান ও পতন হইয়াছিল। এই স্থানেই যদুবংশের বিনাশ হইয়াছিল। মামুদ গজনবী আদি ডাকাতেরা এই স্থান অনেকবার আক্রমণ করিয়াছিল। এই স্থানের ধন সম্পত্তির অনুমান করা দুসাধ্য ছিল। এই স্থানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রভাষ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম প্রভাষ তীর্থ হইয়াছে। প্রভাষ-যজ্ঞের সংবাদ পাইয়া নন্দ, যশোদা ও ব্রজের গোপীনীগণ মধুসুদনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। এই স্থানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সহিত উহাদের শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সংক্ষেপে এই তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম। এখন ইহার প্রধান দেখিবার উপযুক্ত স্থানগুলি বর্ণন করিব।

(১) পদ্মকুণ্ড—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের, শ্রীলক্ষ্মীর, কামধেনু ও ব্যাধের প্রতিমূর্ত্তি আছে। এইস্থানে ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রক্তকমল সদৃশ চরণ যুগলে তীর বিদ্ধ করিয়াছিল। শ্রীভগবান সেই রক্তাক্ত চরণ যুগল এই কুণ্ডে ধৌত করিয়াছিলেন।

(২) ভালক কুণ্ড—এই স্থানে একটী অশ্বত্থ গাছ আছে, ইহার মূলে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র ব্যাধের বাণে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৩) শশিভূষণ মহাদেব।

(৪) দৈত্যসুদন।

(৫) কৃষ্ণমূর্ত্তি।

(৬) সোমনাথ মহাদেব।

(৭) নন্দিকেশ্বর।

(৮) প্রচীন সূর্য্যমন্দির।

(৯) শ্রীবলভদ্রজিউর শরীর ত্যাগ করিবার স্থান।

(১০) অবর্দ্দিণ বিনায়ক।

এই সকল দেখিবার উপযুক্ত স্থান। এই স্থানে সরস্বতী নদী পঞ্চ ধারায় বিভক্ত হইয়া সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। সঙ্গমে স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে হয়। নাথ দ্বারায় নাথজিউর মন্দির দেখিবার উপযুক্ত।

ডাকোর জিউ।

এই স্থানে বি, বি, সি, আই, (B. B. C. I. Ry) রেলওয়ের অন্তর্গত গোধরা শাখার (Branch) লাইন আছে। ডাকোর ষ্টেশন হইতে ডাকোর নগর দেড় মইল দূরে অবস্থিত। রণছোড় জিউর মন্দিরের জন্য এই নগর প্রসিদ্ধ। রণছোড় জিউর পুজারীরা এই মূর্ত্তি দ্বারকা হইতে চুরী করিয়া ডাকোরে অনেক টাকা খরচ করিয়া স্থাপিত করিয়াছিল। মন্দিরটী অতি সুন্দর। স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত দিয়া মোড়া, দেখিতে অত্যন্ত মনোহর। এই মন্দিরটী তৈয়ার করিতে ও দেবমূর্ত্তি স্থাপিত করিতে প্রায় লক্ষাধিক টাকা খরচ হইয়াছিল। ডাকোরে একটী খুব বড় ঝিল আছে। ডাকোর ও কপিধ্বজ নগরের মধ্যে একটী গড়ম জলের কুণ্ড আছে, প্রবাদ আছে এই কুণ্ডে স্নান করিলে সর্ব্বরোগ বিনাশ হয়। এই নগর ডাকোর হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে যাইবার জন্য ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদি পাওয়া যায়। ডাকোরে যাত্রীদের জন্য ধর্ম্মশালা আছে। এখানে জৈন ধর্ম্মাবলম্বীদের একটী খুব বড় মন্দির আছে। এই মন্দির নির্ম্মাণে অনেক টাকা খরচ হইয়াছে। এই মন্দিরও দেখিবার উপযুক্ত।

পুণা

পুণায় পার্ব্বতী পাহাড় ও পাণ্ডারপুর জী, আই, পী, রেলওয়ের (G. I. P. Ry.) কুরুডু আড়ী জংসন হইতে পাণ্ডারপুর ষ্টেশন পর্য্যন্ত লাইন গিয়াছে। রাধা কৃষ্ণের মন্দির অতি উত্তম ও দেখিবার উপযুক্ত। কিষ্কিন্ধাপুরী বালী ও সুগ্রীব রাজার রাজধানী, হস্পেট জংসন হইতে প্রায় নয় মাইল দূরে।

উজ্জয়িনী।

উজ্জয়িনী বা অবন্তিকা হিন্দুদিগের বহু প্রাচীন ও প্রতিভাপন্ন নগরী। এক সময় এই স্থান সংস্কৃত-ভাষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইহা রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। যাহার নামে সম্বৎ উত্তরয় ভারত হইতে প্রকাশিত; যিশুখৃষ্ট হইতে ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে ইহা আরম্ভ হইয়াছিল। কবি কালিদাস নিজ জ্যোতির্বিদ্যাভরণ পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, বিক্রমাদিত্যের সভায় শঙ্কু, বররুচী মণি অংশুদত্ত, জিষ্ণু, ত্রিলোচন, হরি ঘটখর্পর, এবং অমরসিংহ আদি কবি, সত্য, বরাহমিহির, শ্রুতসেন, বাদরায়ণ, মণিত্য এবং কুমারসিংহ আদি জ্যোতিষি ও ধন্বন্তরী, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটখর্পর কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচী নবরত্ন ছিলেন।

উজ্জয়িনী বি, বি, সা, আই, B. B. C. I. এবং জী, আই, পী G. I. P রেলওয়ের একটী জংসন ষ্টেশন। উজ্জয়িনী সাতটী তীর্থের মধ্যে একটী তীর্থ। ইহা একটী পীঠস্থান। এই স্থানে সতীদেবীর উপরকার ঠোট (ওষ্ঠ) পড়িয়াছিল। দেবীর নাম অবন্তি এবং ভৈরবের নাম লম্বক ভৈরব।

সহর—রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে, ছয় মাইলেব ঘেরা নূতন সহরের বস্তি। পুরাতন উজ্জয়িনীর ধ্বংশাবশেষ নূতন সহর হইতে প্রায় এক মাইল দূরে। সহরের দক্ষিণ সীমার নিকটে জয়পুরের রাজা জয়সিংহের নির্ম্মিত অবজারভেটারী (Obser-vatory) অর্থাৎ গ্রহাদি দর্শন স্থান আছে। ইহার যন্ত্র সকল ব্যর্থ পড়িয়া আছে।

উজ্জয়িনীতে সাতটী পুষ্করিণী প্রসিদ্ধ।

(১) বিষ্ণুসাগর।
(২) রুদ্র সাগর।
(৩) গোবর্দ্ধন সাগর।
(৪) পুরুষোত্তম সাগর।
(৫) ক্ষীর সাগর।
(৬) পুষ্কর সাগর।
(৭) রত্নাকর সাগর।

ইহার মধ্যে কতকগুলি বে-মেরামত পড়িয়া আছে। যেমনই ইন্দোরের বৃদ্ধি হইতেছে, তেমনই উজ্জয়িনীর হ্রাস হইতেছে। সহর কমিয়া যাইতেছে, তথাপি ইহার তেজারতী কারবার অনেক বড়।

ক্রিয়াকর্ম্ম—এখানকার ব্রাহ্মণেরা বড় কৃপাবান।

মেলা—কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমার দিন উজ্জয়িনীতে মেলা হয়। এখানে কুম্ভ যোগে খুব বড় মেলা হয়। এই সময় ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের সাধু, গৃহস্থ শিপ্রা নদীতে স্নান করিবার জন্য একত্রিত হয়। ইহাদের ভিতর অধিকাংশ নাগা সন্ন্যাসী দর্শন করিতে আসে।

শিপ্রানদী—তীর্থ অবন্তিকার নিকটে শিপ্রানদীতে রামঘাটে স্নান এবং তীর্থ কর্ত্তব্য আদি সমাপ্ত করিয়া রুদ্র সাগর, অগস্ত্যেশ্বর, কোটিশ্বর মহাদেব, হরিসিদ্ধ দেবী (এই দেবীকে তুষ্ট করিবার জন্য মহারাজ বিক্রমাদিত্য চৌদ্দটী নরবলি দিয়াছিলেন। মহাকাল মন্দির, কেদারেশ্বর, হর্ষ-দ্বীপ, বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্ত্তি, মিক্রমাদিত্যের সিংহদ্বারের ভগ্নাবশেষ, যোগসিদ্ধ পর্ব্বত,—বিক্রমাদিত্যের প্রসিদ্ধ সিংহাসন এই স্থানেই প্রোথিত আছে। ভক্তি হরির সিদ্ধ পীঠ, মহর্ষি সন্দীপনের আশ্রম, এখানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। কালভৈরব (অবন্তিকা-পুরীর রক্ষক) কালিকা দেবী দেখিবার উপযুক্ত।

মহাকালেশ্বর শিব—সুপ্রসিদ্ধ দ্বাদশ লিঙ্গের মধ্যে উজ্জয়িনীর প্রধান দেবতা মহাকালেশ্বর শিবলিঙ্গও একটী। মহাকালেশ্বর শিবের মন্দির পাঁচতলা। নীচের তলায়, ভূমির নীচে অর্থাৎ পাতালে একটী বৃহৎ আকারের মহাকালেশ্বর শিবলিঙ্গ আছে। মহাকালেশ্বরের নিকট পার্ব্বতী ও গণেশের মূর্ত্তি আছে।

সহরের অন্যান্য দেবতা।

(১) একটী মন্দিরে নাগচন্দ্রেশ্বর।

(২) ব্রহ্মা ও লক্ষ্মীর সহিত ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের চতুর্ভুজ মনোহর মূর্ত্তি (ক্ষীরসাগর পুকুরের নিকটে)।

(৩) শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, জানকী ও হনুমানের মূর্ত্তি বিষ্ণুসাগরে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(৪) গোয়ালিয়রের মহারাণী শ্রীমতী বৈজাবাই নির্ম্মিত গোপালমন্দির সরাফা মহল্লায় অবস্থিত (যেখানে স্বর্ণ রৌপ্যের দ্রব্য বিক্রয় হয়) মন্দির দেখিতে অতি সুন্দর।

(৫) রণমুক্তেশ্বর মহাদেব শিপ্রা নদীর প্রয়াগ ঘাটের নিকটে।

(৬) সিদ্ধবট—ইহা অতি পুরাতন বটবৃক্ষ, সহর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। কার্ত্তিক মাসে এখানে মেলা হয়। এখানে ধর্ম্মশালা আছে।

(৭) কালভৈরব—সিদ্ধবট হইতে ফিরিবার রাস্তায়।

(৮) সান্দিপনী মুনির আশ্রম—সহর হইতে দুই মাইল দূরে, গোমতী-গঙ্গা নামক পাকা পুষ্করিণীর নিকটে। এখানে ছোট ছোট মন্দিরের ভিতর সান্দিপনী মুনি, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলভদ্র ও সুদামা ইত্যাদি সকল বিদ্যার্থীর মূর্ত্তি বসান আছে।

(৯) রাজা ভরতের গুহা—সহর হইতে দেড় মাইল দূরে, উত্তর দিকে একটী গুহা আছে, ইহাকে লোকে ভরতরীর (ভর্তৃহরী) গুহা বলে। এই গুহার ভিতরে কতকগুলি ছোট ছোট অন্ধকার ঘর আছে। সেখানকার পূজারীরা প্রদীপ হাতে করিয়া যাত্রীদের দর্শন করায়। প্রথম ঘরে রাজা বিক্রমাদিত্যের ছোট ভাই ভর্তৃহরীর যোগাসন (গদী)। অন্য ঘরে গোরক্ষনাথের মূর্ত্তি আছে।

ওঁকারনাথ।

মউ ছাউনি (Military station) হইতে ৩৬ মাইল দক্ষিণে নর্ম্মদা নদীর ধারে মোরৎকা নামে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে এবং মোরৎকা হইতে সাত মাইলের মধ্য দেশের (Central Provinces) নিভার জেলায় নর্ম্মদা নদীর ধারে মান্ধাতা নামক একটি দ্বীপে

ওঁকারনাথ শিবের মন্দির আছে। মোরৎকা হইতে মান্ধাতা দ্বীপ পর্য্যন্ত বয়েল গাড়ীর (গরুর গাড়ীর) একটী সুন্দর রাস্তা গিয়াছে। অমরেশ্বর হইতে নৌকা দ্বারা নর্ম্মদা নদী পার হইয়া দ্বীপে যাইতে হয়।

ষ্টেশন হইতেও নৌকাযোগে ওঁকারনাথ যাইবার রাস্তা আছে। কিন্তু নদীর উজান বাহিয়া যাইতে হয়। নর্ম্মদার উত্তর ধারে মান্ধাতা দ্বীপ অবস্থিত। পুরাণে লেখা আছে সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতা এই স্থানে শিবপূজা করিয়াছিলেন, সেই কারণে ইহার নাম মান্ধাতার দ্বীপ হইয়াছে। ওঁকারনাথের মন্দির দ্বীপের দক্ষিণ দিকে, নর্ম্মদার দক্ষিণ পার্শ্বে ওঁকার পুরীতে অবস্থিত। ওঁকারেশ্বর শিবলিঙ্গ হাতে তৈয়ারী করা নহে। পার্শ্বে পার্ব্বতীর মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের ভিতর অখণ্ড প্রদীপ (এই প্রদীপ অদ্যাবধি নিভে নাই) জ্বলিতেছে। দু'মুখো মন্দিরের ভিতর রাত্রে ওঁকারনাথ জিউর পালঙ্ক পাতা হয়। ইহার পার্শ্বের কামরায় শুকদেব জিউর মূর্ত্তি এবং রাজা মান্ধাতার লিঙ্গ মূর্ত্তি আছে। ওঁকার জিউর মন্দিরের উপরিভাগে ঈশানকোণে, মন্দিরের সহিত সংলগ্ন মহাকালেশ্বর শিবের একটী বড় মন্দির আছে এবং এই মন্দিরের উপরিভাগে আর একটী শিবলিঙ্গ আছে। ওঁকারনাথের মন্দিরের নিকটে অবিমুক্তেশ্বর, জ্বালেশ্বর, কেদারেশ্বর, গণপতি, কালিকাদেবী আদি দেবতাদিগের মন্দির আছে। মন্দিরের নিম্নে কোটীতীর্থ নামে নর্ম্মদা নদীতে একটী বাঁধান ঘাট আছে। যাত্রীরা এখানে স্নান ও তীর্থ সম্বন্ধীয় ভেট দিয়া থাকেন। Island (দ্বীপ) এর ভিতরেই ওঁকারনাথের দুইটী পরিক্রম আছে, ইহা মন্দির হইতে আরম্ভ হইয়া সেইখানে সমাপ্ত হয়। পরিক্রম করিবার সময়ে নিম্নক্রমে মন্দিরগুলি ক্রমান্বয়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) তিলভাণ্ডেশ্বর শিবের মন্দির।

(২) ঋণ মুক্তেশ্বর মহাদেবের মন্দির।

(৩) গৌরী-সোমনাথের মন্দির। সোমনাথ একটী সুবৃহৎ শিবলিঙ্গ। যাহারা ছোট পরিক্রমা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই স্থান হইতেই ফিরিয়া আসেন।

(৪) সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের পুরাতন মন্দির। এই মন্দিরের সামনে, ফটকের উপর ভীম ও অর্জ্জুনের বিশাল মূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহার পর খানিক দূরে যাইলে নর্ম্মদার তীরে একটী সোজা (Steep) পাহাড় (Hill) দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে লোকে ইহার উপর হইতে লাফাইয়া মোক্ষপদ পাইবার জন্য আত্মহত্যা করিত। ওঁকার পুরীর সামনে নর্ম্মদার দক্ষিণ ধারে (Right Bank) একটী উচ্চ ঢিপির উপরে বিষ্ণুপুরী তীর্থ আছে। কপিল ধারা নামে একটী ছোট জলের ধারা নালার আকারে বহিয়া গোমুখীর ভিতর হইয়া নর্ম্মদায় গিয়া পড়িয়াছে। ঐ স্থানের নাম কপিল-সঙ্গম। ব্রহ্মপুরীতে কপিলেশ্বর শিবলিঙ্গ এবং ব্রহ্মার প্রতিমূর্ত্তি আছে। বিষ্ণুপুরীতে একটী মন্দিরে ভগবান বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও তাঁহাদের পার্শ্বদদের মূর্ত্তি আছে। একটী ছোট মন্দিরের ভিতর কপিল মুনির চরণ চিহ্ন এবং কপিলেশ্বর মহাদেব আছেন। ব্রহ্মপুরী ও বিষ্ণুপুরীর মধ্যে কাশীবিশ্বনাথের নূতন মন্দির

আছে। বিষ্ণুপুরী হইতে সামান্য পশ্চিমে নর্ম্মদার তীরে জলের ভিতর মার্কণ্ডেয় শিলা বলিয়া একটী প্রস্তর (Rack) আছে এবং এই পাথরের উপর যমযাতনা হইতে মুক্ত হইবার জন্য যাত্রীরা গড়াগড়ী দেয়। ইহার নিকটে পাহাড়ের পার্শ্বে মার্কণ্ডেয় ঋষির একটী ছোট মন্দির আছে।

সত্যপুরাণ—নর্ম্মদার তটে ওঁকার, কপিলসঙ্গম, ও অমরেশ মহাদেব পাপ সমূহের নাশ করিয়া থাকেন। যেথানে কাবেরী এবং নর্ম্মদার সঙ্গম হইয়াছে, সেইখানে কুবের একশত বর্ষ পর্য্যন্ত দিব্যতপ করিয়াছিলেন এবং শিবের নিকট বড় পাইয়া যক্ষ সমূহের রাজা হইয়াছিলেন। এখানে স্নান করিয়া শিবের পূজা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয় এবং রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। এখানে যে কেহ তুষানল অথবা অনশন ব্রত ধারণ করে তাহার সর্ব্বত্র যাইবার শক্তি হয়।

অমরাবতী

বরধা জংসন হইতে ৫৯ মাইল পশ্চিমে বডনেরা রেলওয়ে ষ্টেশন আছে, ইহার উত্তরে ৬ মাইল দূরে একটী ব্রাঞ্চ (Branch) লাইন অমরাবতীতে গিয়াছে। অমরাবতীর চারিধারে সওয়া দুই মাইল লম্বা এবং ৬২ ফিট উচ্চ পাথরের মজবুত দেয়াল আছে, ইহাতে পাঁচটী ফটক এবং চারিটি জানালা আছে। নিজাম সরকার এখানকার ধনী সদাগরদের, পিণ্ডারিদের হাত হইতে বাঁচাবার জন্য ১৯ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ইহা তৈয়ার করাইয়াছিলেন। অমরাবতী দুই ভাগে বিভক্ত, কসবা এবং পেট। অমরাবতীর সমস্ত কুপের জল লবণাক্ত (খারা) অমরাবতীর সমস্ত দেব মন্দিরের ভিতর আটটী মন্দির প্রসিদ্ধ এবং সেই আটটীর মধ্যে এক হাজার বৎসরের পুরাতন অম্বার মন্দির সর্ব্ব প্রধান।

অজন্তা।

অজন্তায় যাইতে হইলে (G. I. P. Ry.) জী, আই, পি, রেলের পাঞ্চোরা শাখা লাইনের পাহুর ষ্টেশন দিয়া যাইতে হয়। পাহুর হইতে অজন্তা সাত মাইল দূরে। পাহুরে একটী মাত্র ধর্ম্মশালা আছে। প্রাচীনকালে ইহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই স্থানে ভারতীয় শিলা তক্ষণ এবং চিত্রকলার একটী অপূর্ব্ব নিদর্শন রহিয়াছে। এখানকার চিত্রকলা দেখিলে চিত্ত প্রফুল্লিত হইয়া উঠে। এই শিল্পকলার প্রশংসা কেবল ভারতবাসী নয়, সমগ্র পৃথিবীর যাত্রী (Towrist) যাহারা চিত্রকলায় (শিল্পের) পারদর্শি, তাঁহারাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকেন।

প্রায় ২৬০ (দুইশত ষাট) ফিট উচ্চ একটী পাথরের রক (Rack) নির্ম্মিত দেয়াল, ইহা অর্দ্ধ-গোলাকার অবস্থায় আছে এবং সেইস্থানে একটী ঝরণা আছে, যাহা ৩৫ হইতে ১০১ ফিট পর্য্যন্ত উপরে ও ২।৩ মাইল পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত ছোট এবং বড় ২৭টী গুহা রহিয়াছে। এইস্থানে পাহাড়ের ভিতর পাথর কাটিয়া একটি অতি সুন্দর গুহা-মন্দির নির্ম্মিত আছে, ইহা বৌদ্ধ মন্দির। এলিফেণ্ট (Eliphant) আলোরা (Alora) ও অজন্তাগুহা অনেক দূর দেশান্তর হইতে লোকে দেখিতে আসে।

আলোরা।

ইহা এইচ, জী, ভী রেলওয়ের (H. G. V. Ry) দৌলতাবাদ ষ্টেশন হইতে সাত মাইল দূরে। জী, আই, পি রেলওয়ে (G. I. P. Ry) মনমাড় ষ্টেশনে এইচ, জী, ভী, রেলওয়ের জংসন। ইহা হায়দারাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত। দৌলতাবাদ হইতে আলোরা যাইবার জন্য সোয়ারী (Conveyance) পাওয়া যায়। এখানকার গুহাও বিখ্যাত। এখানে হিন্দু দেবদেবীর মন্দির অপেক্ষা জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরই বেশী। বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন গুহাগুলি পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত। দক্ষিণদিকে ১২টী বৌদ্ধদের গুহা আছে, উত্তরে পাঁচটী জৈন গুহা এবং মধ্যে উপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১৭টী গুহা ছাড়া, ১৭টী হিন্দুদের গুহা আছে। গুহাগুলির সম্মুখে বড় বড় ঝরণা আছে। চারিটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ গুহার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) ধারওয়ার গুহা (এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন)
(২) বিশ্বকর্ম্মার চৈত্য গুহা (ইহা ৮৫ ফিট লম্বা)
(৩) দ্বিতল গুহা।
(৪) ত্রিতল গুহা।

বিশ্বকর্ম্মার সভায় বুদ্ধের একটী বৃহৎ মূর্ত্তি আছে, ইহাকে এখানকার লোকেরা বিশ্বকর্ম্মা বলে। সমস্ত গুহার ভিতর কৈলাশ নামক গুহা-মন্দির অতি সুন্দর। প্রবাদ আছে যে প্রসিদ্ধ পুরের রাজা মধু, যিনি এই নগর তৈয়ার করিয়াছিলেন, তিনিই কৈলাশ আদি গুহা-মন্দিরের নির্ম্মাণ কর্ত্তা। ইহা বাহির হইতে ময়দানে একটী মন্দির বলিয়া বুঝায়, ইহার ভিতরে অনেকগুলি গুহা-মন্দির আছে, যাহার ভিতর ৮।১০ ফিট উচ্চ বড় বড় মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। কৈলাশ মন্দিরটী ১৪৬ ফিট পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা, উত্তর দক্ষিণে ১০৯ ফিট চওড়া এবং ৫০ ফিট উচ্চ। হিন্দু গুহার ভিতর দশ অবতারের গুহাটী সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। উহার বড় কামরাটী ১০৩ ফিট লম্বা এবং ৪৫ ফিট চওড়া কামরার ভিতরে ৪৬টী থাম আছে।

হিন্দুগুহা-মন্দির হইতে প্রায় এক মাইল উত্তরে জৈন গুহারদিকে একটী সরু রাস্তা গিয়াছে এবং যে স্থানে জগন্নাথ সভা এবং ইন্দ্র সভা আছে। ইহার অতিরিক্ত আদিনাথ

সভা, পরশুরাম সভা, লঙ্কা, বরযাত্রী সভা, ত্রিলোক ইত্যাদি অনেকগুলি স্থান দেখিবার উপযুক্ত। এলোরার সমস্ত মন্দিরগুলি পাহাড়ের ভিতরে, পাহাড়ের পাথর কাটিয়া প্রস্তুত অর্থাৎ আলাদা পাথর আনিয়া বা সেইখানকার পাথর কাটিয়া পৃথক ভাবে অন্য পাথরে জোড়া দিয়া তৈয়ার করা হয়।

নাসিক।

এই স্থান জী, আই, পী (G. I. P.) রেলের বোম্বাই-দিল্লী লাইনের অন্তর্গত নাসিক ষ্টেশন হইতে তীর্থ প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। নগরটী গোদাবরী নদীর ধারে স্থিত। ষ্টেশনে সকল প্রকারের সোয়াড়ী যাত্রীদের তীর্থ স্থানে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকে। থাকিবার জন্য এখানে ধর্ম্মশালা আছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বনবাসের সময় এখানে অনেক দিন পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন, এই স্থানেই সুর্পনখা রাক্ষসীর নাক কাটা হইয়াছিল। সীতা হরণও এই স্থানেই হইয়াছিল। এখানে একটী সুবৃহৎ আট বর্গ মাইল লম্বা ঝিল আছে। টংসা নদীর বাঁধের জন্য ইহাতে অনেক জল আছে। এই ঝিল হইতেই সমস্ত বোম্বাই সহরে জল সরবরাহ হয়।

পঞ্চবটী—গোদাবরী নদীর বাম পার্শ্বে, দুই মাইল ঘেরায়। একটী বটবৃক্ষ আছে, লোকে ইহাকেই পঞ্চবটী বলিয়া থাকে। বটবৃক্ষের নিকটে একটী গুহা আছে, তাহাকে সীতা-গুহা বলে। ইহার ভিতর যাইতে হইলে অনেক কষ্টে শুইয়া বসিয়া যাইতে হয়। এখানকার পুজারী যাত্রীদের নিকট হইতে গুহার দ্বারে এক পাই করিয়া দর্শনী লয়। এই গুহার ভিতরে প্রথমেই শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও জানকীর মূর্ত্তি দর্শন হয়। অন্য গুহার নীচে রত্নেশ্বর মহাদেবের মূর্ত্তি আছে।

তপোবন—কস্‌বা হইতে দুই মাইল দূরে গোদাবরী নদীর বাঁ ধারে গৌতম ঋষির তপোবন। পঞ্চবটী হইতে একটু আগে লক্ষ্মণের মূর্ত্তি আছে, আর খানিকটা পরে হনুমান জিউর মূর্ত্তি, ইহার পর গোদাবরী ও কপিলা নদীর সঙ্গম। এই স্থানে পঞ্চতীর্থের নামে পাঁচটী কুণ্ড আছে যথাঃ—

(১) অগ্নিযোনী (গভীর)।
(২) বিষ্ণুযোনী
(৩) রুদ্রযোনী :
(৪) ব্রহ্মযোনী।
(৫) মুক্তিযোনী।

এই পঞ্চতীর্থের ভিতর সৌভাগ্য তীর্থে কপিলা সঙ্গম ও সুবর্ণরেখা তীর্থ মিলিত হইয়া অষ্টতীর্থ হইয়াছে। গোদাবরী ও কপিলা সঙ্গমের নিকট সপ্ত ঋষিদের স্থান। এই স্থানের কাছাকাছি দুই তিন ক্রোশের ঘেরায় জটায়ুর মৃত্যুস্থান, অগস্ত্যমুনীর আশ্রম, অমৃতবাহিনী নদী ইত্যাদি অনেক তীর্থ আছে। অকোল্‌হার পশ্চিমে এক ক্রোশের কাছাকাছি সাইখেড়া নামক গ্রামে মারীচের মৃত্যু স্থান।

পাণ্ডব-গুহা—ইহাকে ইংরাজেরা "লিনা কেব্‌স" (Lina caves) বলিয়া থাকেন। ইহা বৌদ্ধদিগের নির্ম্মিত, বর্ত্তমানে ইহাকে হিন্দুরা পাণ্ডব-গুহা বলিয়া থাকেন। ইহার ভিতরের বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলিকে হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া হিন্দুরা পূজা করিয়া থাকেন।

কল্যাণ।

ইহা নাসিক হইতে ৮৩ মাইল দূরে। এইখানে ৮টী ছোট ছোট জলাশয় আছে। একটী জলাশয়ের নিকটে সদানন্দের মন্দির ও অনেকগুলি কূপ আছে। ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল দূরে প্রাচীন অম্বরনাথের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে।

অম্বকেশ্বর।

নাসিক কসবা হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে, নাসিক জেলার অন্তর্গত ত্রয়ম্বক বলিয়া একটী মিউনিসিপাল কস্‌বা তথা পবিত্র তীর্থস্থান। নাসিক হইতে ত্রয়ম্বক পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা গিয়াছে। ত্রয়ম্বক যাওয়া আসার টাঙ্গা ভাড়া ৪৲ চারি টাকা। এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে। ত্রয়ম্বকে অনেকগুলি জলাশয়, মন্দির ও বড় বড় বাড়ী আছে। সব রকম খাবার জিনিষ এখানে পাওয়া যায়। ইহার নিকটবর্ত্তি পাহাড় হইতে পবিত্র গোদাবরী নদী প্রবাহিত হইয়াছে। ত্রয়ম্বকেশ্বর, শিবের বারটী জ্যোতির্লিঙ্গের ভিতর অন্যতম। নাসিকের যাত্রী এই তীর্থ অবশ্য দর্শন করিয়া থাকেন। ত্রয়ম্বকেশ্বরে বা নাসিকে কুম্ভ মেলা অত্যধিক হইয়া থাকে, ত্রয়ম্বকেশ্বরের পরিক্রমা করিতে হইলে অনেকগুলি পাহাড় নামিতে ও উঠিতে হয়।

কুশাবর্ত্ত পুষ্করিনী—গ্রামের নিকট কুশাবর্ত্ত কুণ্ড বলিয়া একটী চতুষ্কোণ পুষ্করিনী আছে। যাত্রীরা গোদাবরী নদীর জলে নারিকেল উপহার দিয়া তাহার পর স্নান করেন। ইহার জলে কাপড় কাচা নিষেধ। কুশাবর্ত্ত হইতে কিছু দূরে একটী পাহাড়ের নিকটে গঙ্গাসাগর বলিয়া একটী পুকুর আছে, ইহার কূলে নিবৃত্ত দেবীর মন্দির আছে।

ত্রয়ম্বক শিবের মন্দির ৮০ ফিট উচ্চ, সাধারণ যাত্রী ত্রয়ম্বক শিবের মন্দিরে যাইতে পায় না। দালানে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতে হয়। পূজা করিতে হইলে পুজারীর হাতে পূজার সামগ্রী দিতে হয়। কিন্তু মেলার সময় এই নিয়ম থাকে না। শিবচতুর্দ্দশীর দিনে এখানে খুব ভীড় হয়। ত্রয়ম্বকের যাত্রীদের জয়-ভাটের পাহাড়ও একটী দৃশ্য।

বোম্বাই

এই ছোট পুস্তিকায় বোম্বাইয়ের বিষয় সম্পূর্ণভাবে লেখা ধৃষ্টতা মাত্র। অতএব আমি নিজ যাত্রীপাঠকদিগের সুবিধায় জন্য দেখিবার উপযুক্ত স্থানগুলি এবং তাহার ভিতর যেগুলি অধিক উপযোগী সেইগুলির নাম উল্লেখ করিলাম।

(১) বোম্বাই দেবী।
(২) বালকেশ্বর।
(৩) রাণী বাগ।
(৪) ডাকোর জিউর মন্দির।
(৫) পার্শিদের অগ্নিমন্দির।
(৬) মহালক্ষী।
(৭) ক্রফোর্ড বাজার।
(৮) বড় বন্দর।
(৯) মোতী বাজার।
(১০) প্রিন্স ডক।
(১১) অপোলো বন্দর।
(১২) তাজমহাল হোটেল।
(১৩) বেণ্ড ষ্টেণ্ড।
(১৪) রাজা রায়ের ক্লক টাওয়ার (Clock Tower
(১৫) বিশ্ববিদ্যালয়।
(১৬) পিজড়া পোল।
(১৭) গবর্ণমেণ্ট হাউস।
(১৮) হাইকোর্ট।
(১৯) পশুশালা।
(২০) লাইট হাউস।
(২১) মিউজিয়াম। (Musium)
(২২) অকোলার স্মারক চিহ্ন।
(২৩) এলিফেন্টষ্টোন বাগান।
(২৪) ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ষ্টেশন।
(২৫) টাওয়ার অফ সাইলেন্স।
(২৬) চৌপাটে।
(২৭) ফিরোজ সা মেহতার বাগান।

এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে কিন্তু মাধো বাগ ও হীরাবাগের ধর্ম্মশালা অতি উত্তম। এখান হইতে গোকর্ণ তীর্থে যাইতে হইলে ষ্টিমারে যাইতে হয়। বোম্বাই পশ্চিম দেশের যাত্রীদের জন্য জাহাজে উঠিবার একটী প্রধান বন্দর। বোম্বাই সহর হইতে পূর্ব্বোত্তরে একটী রাস্তা "বড়গ্রাম, কল্যাণ, নাসিক, ধূলিয়া, মহ, ইন্দোর, ফতেহাবাদ, গোয়ালিয়র ইত্যাদি নগরের মধ্য দিয়া আর আগে গিয়াছে। আর অন্য একটী রাস্তা পূর্ব্বদিকে আহমদনগর, পৈঠন, নাগপুর, ভাণ্ডারা, রাজনন্দ গ্রাম, রায়পুর, ফুলঝর, সম্বলপুর, ক্যোঝোর, উলুবেড়িয়া হইয়া কলিকাতায় গিয়াছে। এখান হইতে ৩০।৩২ ঘণ্টায় ষ্টিমারে (Steamer) দ্বারায় দ্বারকায় পৌছান যায়।

বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ অট্টালিকার মধ্যে এলিফেনষ্টোন সার্কেল, কাষ্টম্ হাউস, টাউনহল, ট্যাকসাল এবং ক্যাথেড্রাল দেখিবার উপযুক্ত।

এখানে প্রতিবৎসর অতি ধুমধামের সাহিত গণেশ উৎসব হয়। দীপাবলির উৎসব পাঁচ দিন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এখানকার লোকেরা এই দিনে খুব ধুমধামের সহিত সমুদ্রের পূজা করে।

বালেশ্বরের মন্দির—মালাবার পাহাড়ের দক্ষিণ ভাগের পশ্চিম ধারে বালেশ্বর শিবের দর্শন করা উচিত। ইহা এখানকার অন্য মন্দির অপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এখানে বাণ তীর্থ নামে একটী অতি উত্তম ছোট সরোবর আছে, ইহার চারি ধারে ব্রাহ্মণদের বসবাস ও দেব মন্দির। প্রবাদ আছে যে শ্রীরামচন্দ্র সীতা হরণের পর এখানে বালীর শিব লিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। (শ্রীরামচন্দ্র) পিপাসার্ত্ত হইয়া কোথাও জল না পাইয়া নিজের বাণ দ্বারায় এই সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

আজমীর।

আজমীর সহর বী, বী, এণ্ড সী, আই, (B. B. & C. I. Ry) রেল লাইনে রাজপুতনার মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ ইংরাজ রাজ্য। ইহার চারি দিকে পাহাড়। তারাগড় পাহাড়ের ঠিক নীচে অর্থাৎ তাহার পদপ্রান্তে। সমুদ্রের জল হইতে ৩০০০ ফিট উচ্চে ইহা অবস্থিত। আজমীর সহর দুইটী উচ্চ পাথরের প্রাচীর দিয়া ঘেরা ; এবং উক্ত দেয়ালে ৫টী ফটক আছে। প্রথমটীকে দিল্লী দরজা, দ্বিতীয়টীকে সদর দরজা, তৃতীয়টীকে আগরা দরজা, চতুর্থটীকে উস্থি দরজা এবং পঞ্চমটীকে ত্রিপলী দরজা কহে। ধর্ম্মশালা, ষ্টেশন হইতে অল্প দূরে অবস্থিত। এখানে থাকিবার জন্য ভাড়াটে বাড়ীও পাওয়া যায়। এখানে জলের কল আছে।

আজমীরে দেখিবার উপযুক্ত স্থান।

১। আনা সাগর ঝিল :—(একাদশ শতাব্দীতে বিশাল দেবের পৌত্র, রাজা আনা নির্ম্মাণ করাইছিলেন।

২। আকবরের কবর (গোরস্থান) :—ষ্টেশনের অতি নিকটে, সম্প্রতি এখানে তহশীল হইয়াছে।

৩। খাজা সাহেবের কবর :—সহরের পশ্চিম দিকে খাজা মুঈন উদ্দিন চিস্তীর প্রসিদ্ধ কবর। এখানকার হিন্দু মুসলমান উভয়ই ইহার পূজা করিয়া থাকেন।

৪। আড়াই দিনের কুটীর :—আলতামাস এই স্থানের সমস্ত জৈন মন্দিরগুলিকে আড়াইদিনে ভুমিসাত করিয়া ফেলিয়া এবং ঐ সমস্ত মন্দিরের মাল মসলা দিয়া একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করে। এই মস্‌জিদের তিন দিক খোলা। ইহার ভিতর ১৮টী থামের চারিটী শ্রেণী আছে। থামগুলি এখনও সেইরূপই আছে। প্রত্যেক থামের পৃথক পৃথক কারু কারিতা। মস্‌জিদের নিকটে জৈনদের দেবদেবীর অনেকগুলি মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। চৌহান রাজ বিলাসদেবের প্রণীত হরকেলী নামক নাটকের কিয়দংশ শিলায় খোদিত করিয়া এই মস্‌জিদে রক্ষা করিয়াছে, আজমীরের প্রধান নদী "বনাস"।

শ্রীনাথ দ্বারা।

উদয়পুর হইতে ২০।২২ মাইল উত্তরে কিছু পূর্ব্বদিক হইতে বনাস নদীর দক্ষিণ তীরে শ্রীনাথদ্বারা বল্লভ সম্প্রদায়ের, বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ স্থান। পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশ হইতে বনাস নদীর ধার পর্য্যন্ত একটী পবিত্র স্থান। এই স্থানে কেহ জীব হিংসা করিতে পারে না। এখানে শ্রীশিবনাথ জিউর মন্দির, বল্লভ সম্প্রদায়ের গোস্বামীদেরই অধিকারে আছে। ইহার শিষ্যেরা এক এক জন মহান্ ধনশালী ও ব্যবসাই মহাজন, ইহারা স্ব স্ব ব্যবসায়ের লভ্যাংশ হইতে কিছু কিছু দিয়া এখানে ভোজ দিয়া থাকে। এখানকার রাজভোগের বড়ই ধুম। কার্ত্তিক মাসে এখানে অন্নকুটের বৃহৎ উৎসব হয়। বল্লভাচার্য্য তৈলঙ্গ দেশের কাকরবল্লী গ্রামবাসী তৈলঙ্গ ব্রহ্মণ লক্ষ্মণ ভট্টের পুত্র ছিলেন, ইহার মাতার নাম ইল্লামগরু ছিল। চম্পারণ্যে, চোরা গ্রামে (চম্পারণে) ইহার জন্ম হইয়াছিল। ইনি দিগ্বিজয় করিয়া নিজের মত চালাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে কাশীতে নিজের শরীর ত্যাগ করিয়াছিলেন।

জয়পুর।

জয়পুর বী, বী, সী, আই, রেলওয়ে (B. B. C. I. Ry) রাজপুতনা মালওয়া রেলওয়ে ও জয়পুর ষ্টেট রেলওয়ের একটী জংসন ষ্টেশন। ষ্টেশন হইতে সহর প্রায় দুই মাইল ব্যবধানে। সহর রক্ষার জন্য সহরের চারিদিকে ২০ ফিট উচ্চ ও ৯ ফিট চওড়া দেয়াল আছে, এবং সেই দেয়ালে গুলি চালাইবার জন্য মাঝে মাঝে ছিদ্র করা আছে। উক্ত দেয়ালে ৭টী ফটক আছে। পূর্ব্বদিকে সূর্য্যপোল, পশ্চিমদিকে চাঁদপোল, উত্তরদিকে আম্বের দরজা ও গঙ্গাপোল, দক্ষিণদিকে কিস্নুন পোল, সঙ্গানের দরজা ও ঘাট দরজা আছে। এইগুলির অতিরিক্ত আরও ছোট ছোট ৭টী জানালা আছে।

জয়পুর সহর একটী প্রসিদ্ধ তেজারতী কারবারের স্থান। এখানকার ছাপার কাপড় অতি সুন্দর ও বিখ্যাত। জহরতের কাজও এখানে অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত হয়।

রাজমহল—মহারাজের প্রাসাদ, সুন্দরবাগ, সুখবিলাস, চন্দ্রমহল (বড় প্রাসাদের মধ্য ভাগ) সাত তলা দেখিতে অতি সুন্দর, দেওয়ান খাস (শ্বেত মার্ব্বেল পাথরে তৈরী) এই সকল দেখিতে অতি সুন্দর ও দেখিবার যোগ্য। এই সকল দেখিতে হইলে রাজাজ্ঞা লইতে হয়।

জয়পুরে দেখিবার উপযুক্ত স্থান।

অবজারভেটারী—দ্বিতীয় সওরাই, জয়সিংহ বেনারস, মথুরা, দিল্লী, উজ্জয়িনী, জয়পুর ইত্যাদি স্থানে অবজারভেটারী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

রামনিবাস উদ্যান—ইহা ভারতের সর্ব্বোত্তম উদ্যানের মধ্যে একটী। বাগানটী সত্তর একড় জায়গা লইয়া বিস্তৃত।

চিড়িয়াখানা—ইহা রামবাগের ভিতরেই আছে; এখানে অনেক রকমের পাখী, বাঘ, ও ভাল্লুক রাখা হইয়াছে।

মিউজিয়াম—ইহা সাজাইবার কায়দা ও অপূর্ব্ব জিনিসগুলির সংগ্রহ প্রশংসনীয়। ২২০০ বর্ষের অধিক বয়সের স্ত্রীর মৃত শরীর এখানে রক্ষা করা হইয়াছে। আর কতকগুলি দেখিবার উপযুক্ত অদ্ভুত জিনিস আছে।

মেয়োহাঁসপাতাল—ইহাতে এক সঙ্গে ১৫০ জন রোগী থাকিতে পারে।

সংস্কৃত কলেজ, বালিকা বিদ্যালয়, মহারাজের কলেজ—(ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে) জয়পুরের শিক্ষা অন্য রাজ্যের শিক্ষা অপেক্ষা অধিক উন্নত।

গলিভাগদ্দী—ইহা জয়পুর হইতে দেড়মাইল পূর্ব্বে আস পাশের ময়দান অপেক্ষা ৩৫০ ফীট উপরে পাহাড়ের উপর একটী সূর্য্যের মন্দির আছে। ইহার বারন্দার নীচে পবিত্র ঝরণার জল পড়িতেছে। এই সকল দেখিবার উপযুক্ত।

দেবমন্দির—জয়পুরে গোবিন্দ জিউ, গোপীনাথ জিউ, গোকুলনাথ জিউ রাধাদামোদর জিউ, রামচন্দ্র জিউ, বিশ্বেশ্বর শিব, ইত্যাদি দেবতাদের মন্দির আছে। মহারাজ মানসিংহ বৃন্দাবনে গোবিন্দ জিউর মন্দির সন ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। যখন আওরঙ্গজেব এই মন্দিরটী ভাঙ্গিবার জন্য হুকুম দেয়, তখন মানসিংহের বংশধরেরা গোবিন্দদেব জিউর মূর্ত্তিটীকে অম্বরে আনিয়া রাখিলেন। সওয়াই জয়সিংহের সময় জয়পুর রাজ মহলের সম্মুখে একটী উত্তম মন্দির তৈয়ার করাইয়া মূর্ত্তিটী স্থাপিত করিলেন। গোকুল নাথের মূর্ত্তিটীকে বল্লভাচার্য্য যমুনাতটে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। গোকুলে ইহার স্থাপনা করা হইয়াছিল। বিশ্বেশ্বর শিবের সুন্দর মন্দিরে মার্ব্বেলের উত্তম কাজ করা আছে। সম্মুখের দেয়ালে সুন্দর গোলাপী কার্য্য করা রহিয়াছে এবং উহার চারিটী কুলুঙ্গিতে চারিটী সুন্দর দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। দর দালানের দক্ষিণে গণেশের ও তাহার বাম পার্শ্বে কালভৈরবের মূর্ত্তি ও তাহার সম্মুখে নন্দীর মূর্ত্তি রহিয়াছে।

ধর্ম্মশালাঃ—ষ্টেশনের নিকট অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে। জয়পুর নগরী সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত। জয়পুর সহরে রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর কেহ নগরে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রাতঃকালে পাঁচ টার সময় আবার ফটক খোলা হয়।

অম্বর (আমর)

বর্ত্তমান অম্বর নগর জয়পুর হইতে সাত মাইল দূরে। ইহা জয়পুর রাজ্যের পুরাতন রাজধানী, মহারাজ মানসিংহের কীর্ত্তি। কালেথোহ নামক পাহাড়ের উপরে, প্রাচীন রাজ-প্রাসাদের ভিতর দশভুজা মহিষমর্দ্দিনীর মন্দির আছে। মহারাজ মানসিংহের আমদরবার, খাস দরবার, রংমহল, যশমন্দির, জয়মন্দির, সোহাগমন্দির, সুখনিবাস, স্নানাগার ইত্যাদি দেখিবার উপযুক্ত। স্ত্রীলোকেরা এ সকল স্থানে যাইতে পায় না। পুরুষেরা যাইতে পারে, কিন্তু জয়পুর দরবার হইতে অনুমতি ও পাশ লইতে হয়।

পুষ্কর তীর্থ রাজপুতনা প্রদেশের আজমীর মাড়ওয়াড় রাজ্যের অন্তর্গত। পুষ্কর আজমীর হইতে সাত মাইল দূরে। আজমীর বী, বী, এণ্ড সী, আই, (B. B. & C. I. Ry.) লাইনের উপর, আজমীর হইতে পুষ্করে যাইতে হইলে সকল রকমের গাড়ী পাওয়া যায়। ইহা ব্রহ্মার নির্ম্মিত একমাত্র তীর্থ এবং সকল তীর্থের গুরু, ইহার সীমার ভিতর কেহ জীবহিংসা করিতে পারে না। ইহার নিকটেই ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় পুষ্করিণী "জ্যেষ্ঠ পুষ্কর" বর্ত্তমান, ইহা অতি পবিত্র। "জ্যেষ্ঠ পুষ্কর" পুষ্করিণীর পাড়ে রাজপুতনার বড় বড় রাজাদের প্রাসাদ (বাড়ী), বাঁধান ঘাট, ধর্ম্মশালা ও মন্দির আছে। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত অর্থাৎ পাঁচদিন পর্য্যন্ত পুষ্করে স্নানে বিশেষ মাহাত্ম্য আছে।

পুষ্কর পরিক্রমা ঃ—জ্যেষ্ঠ পুষ্করের পরিক্রমার অতিরিক্ত পুষ্কর তীর্থের অনেক-গুলি পরিক্রমা আছে।

১ম—তিন ক্রোশের

২য়—পাঁচ ক্রোশের

৩য়—বার ক্রোশের

৪র্থ—চব্বিশ ক্রোশের, ইহাতে অনেকগুলি দেব, ঋষিদের পুরাতন স্থান পাওয়া যায়।

পুষ্করের ধারে ঃ—১ গৌঘাট, ২ ব্রহ্মাঘাট, ৩ কপালমোচন ঘাট, ৪ যজ্ঞঘাট, ৫ দর্ব্বারী ঘাট, ৬ রামঘাট এবং কোটীতীর্থ ঘাট পাথর নির্ম্মিত। পুষ্করিণীর ধারে ও তাহার আসেপাশে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে।

পূর্ব্বকালে পরিহার রাজপুত মান্দারের রাজা নহর রায় মৃগয়া করিতে করিতে পুষ্কর ঝীলের ধারে আসিয়া উপস্থিত হন। রাজা চর্ম্মরোগে পীড়িত ছিলেন, তিনি যখন পিপাসা নিবারণের জন্য নিজের হাত জলের ভিতর দিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে তিনি তাঁহার সমস্ত রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং সেই স্থানে তিনি সকলের সুবিধার জন্য পাকা ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

জ্যেষ্ঠপুষ্কর হইতে দুই মাইল দূরে মধ্য পুষ্কর ও কনিষ্ঠ পুষ্কর আছে। ইহার নিকটেই, শুদ্ধবাপী নামে প্রসিদ্ধ গয়া কুণ্ড আছে এবং ইহার পাঁচ ক্রোশ দূরে প্রাচীন সরস্বতী ও নন্দী এই দুই নদীর সঙ্গম।

দেবমন্দির ঃ—পুষ্করে পাঁচটী প্রধান মন্দির আছে।

১। **ব্রহ্মার মন্দির** ঃ—ইহা এখানকার সর্ব্বপ্রধান মন্দির। ইহার ভিতরে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি আছে। ইহার বাম পার্শ্বে গায়ত্রীর মূর্ত্তি ও দক্ষিণ পার্শ্বে সাবিত্রীর মূর্ত্তি আছে। ইহার চারিধারে সনকাদি চারি ভ্রাতার মূর্ত্তি আছে। এই স্থানেই একটী ছোট মন্দিরের ভিতর নারদের মূর্ত্তি আছে। অন্য একটী ছোট মন্দিরের ভিতর মার্ব্বেল পাথরের তৈয়ারী হাতীর উপর ইন্দ্রের ও কুবের মহারাজের মূর্ত্তি আছে।

২। **বদ্রীনারায়ণের মন্দির** ঃ--

৩। **বরাহ জিউর মন্দির**।—পুরাতন মন্দিরটী জাহাঙ্গীর বাদশা ধ্বংশ করিয়াছিল। উপস্থিত যে মন্দিরটী আছে, সেটী পরে নির্ম্মিত হইয়াছে।

৪। **আত্মেশ্বর বা কপালেশ্বরের মন্দির**।

৫। **সাবিত্রী দেবীর মন্দির**।

উক্ত পাঁচটীর অতিরিক্ত আরও মন্দির আছে। বিশালদেব, অমর রাজ, মানসিংহ, অহল্যাবাঈ, ভরতপুরের রাজা জওয়াহির মল ও মাড়ওয়াড়ের রাজা বিজয় সিংহের তৈয়ারী অনেকগুলি মন্দির ও বাড়ী আছে। জ্যেষ্ঠ পুষ্করের পরিক্রমায় একটী পাহাড়ের নীচে নাগকুণ্ড, চক্রকুণ্ড এবং গঙ্গাকুণ্ড নামক অনেকগুলি ছোট ছোট কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। একটী উচ্চ পাহাড়ের উপরে সাবিত্রী দেবীর মন্দির আছে। এই পাহাড়ের উপর উঠিতে হইলে ৩৮০টী সিঁড়ী উঠিতে হয়।

মাহাত্ম্য ঃ—কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় জ্যেষ্ঠ পুষ্করে স্নান করায় মহৎ ফল হয়। পুষ্কর তীর্থে যাত্রা করিয়া লোকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। এখানে স্নান করিতে হইলে জলজন্তু হইতে সাবধান থাকিতে হয়।

কুরুক্ষেত্র (থানেশ্বর)

এই স্থান—ই, আই, রেলের (E. I. Ry.) দিল্লী আম্বালা লাইনের অন্তর্গত। ষ্টেশনের নিকটেই ধর্ম্মশালা আছে। ষ্টেশন হইতে তীর্থস্থান প্রায় দেড় মাইল দূরে। লোকপ্রসিদ্ধ মহাভারতের বিষয় সকলেই জানেন, এমতাবস্থায় কুরুক্ষেত্রের বিষয় বিশেষ আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন ; কারণ ইহার মাহাত্ম্য সকলেই অবগত আছেন। এই তীর্থের ব্যবধান সত্তর মাইল লম্বা ও বিশ মাইল চওড়া। এখানে ৩৫২টী দর্শন করিবার স্থান আছে। থানেশ্বরে একটী বড় ঝীল আছে এবং এই ঝীলের চারিধারে অনেকগুলি মন্দির আছে।

এই মন্দির গুলি দর্শন করিবার জন্য ঝীলের উপর পোল আছে। দ্বৈপায়ন তীর্থে স্নান করিবার পর **(১) কুন্তিশ্বর মহাদেব (২) পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি (৩) অভিমন্যু (৪) কর্ণ (৫) দ্রোণ (৬) ঘটোৎকচ** ইত্যাদি মহারথীদের মৃত্যুস্থান, **থানেশ্বর মহাদেব, ভদ্রকালী, ভীষ্মের শরশয্যা, অর্জ্জুনের বাণগঙ্গা সরস্বতী** আদির দর্শন করা উচিত।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জিউ যে স্থানে পার্থকে (সখা অর্জ্জুন) গীতার উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই স্থান কোন হিন্দু মাত্রেরই ভুলিবার যোগ্য নহে, ইহা দর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সূর্য্যগ্রহণে—এখানে স্নান করায় বিশেষ মাহাত্ম্য আছে।

দিল্লী।

দিল্লী ই, আই, রেলের (E. I. Ry.) একটী প্রধান ষ্টেশন। ইহা জী, আই, পী, (G. I. P) বী, বী, সী, আই, (B. B. C. I.) ও এন, ডবলু, আর, (N. W. Ry.) রেলের জংসন ষ্টেশন। ইহা যমুনার ধারে অবস্থিত। এই স্থানে কত বড় বড় রাজা ও রাজনীতিজ্ঞের উত্থান ও পতন হইয়াছে। এক সময় এই স্থানে সভ্যতার পরাকাষ্ঠা ছিল। যাহা স্মরণ হইলে দুঃখ সাগরে ভাসিতে হয়। আমি সংক্ষেপে এই নগরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও দেখিবার উপযুক্ত স্থানগুলির নাম উল্লেখ করিলাম।

১। রাণীবাগ।
২। চাঁদনী চক।
৩। ক্লক টাওয়ার।
৪। জুম্মা মস্‌জিদ।
৫। তুগলকাবাদ।
৬। আলাউদ্দিনের কেল্লা।
৭। ফিরোজ শাহের ৬৪টী থাম।
৮। কাল মহল।
৯। যোগমায়ার মন্দির।
১০। দর্ব্বার আম।
১১। দর্ব্বার খাস।
১২। ময়ূর সিংহাসন যেখানে স্থাপিত ছিল সেই স্থান অর্থাৎ মর্ম্মর বেদী
১৩। সফদার জাঙ্গ (ভুল ভুলিয়া)
১৪। কর্সিয়াবাগ। (বাগান)।
১৫। রোসান আরা বাগ ন।
১৬। মানমন্দির।
১৭। হুমায়ুনের কবর।
১৮। মিউটিনী মেমোরিয়াল।
১৯। রায় পিথৌরার লৌহ স্তম্ভ।
২০। কুতুব মীনার। ষ্টেশন হইতে ১১ মাইল তফাত।
২১। মিউজিয়াম (কেল্লার ভিতর)
২২। রঙ্গ মহাল।
২৩। তসবীর খানা (ছবির ঘর)।
২৪। হাম্মাম (স্নানাগার)।
২৫। মোতী মস্‌জিদ।

এইগুলি দেখিবার উপযুক্ত। ৵০ দুই আনার টিকিটে সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

দিল্লীর ঐশ্বর্য্য, দিল্লীর সৌন্দর্য্য, দিল্লীর ইতিহাস, সবই প্রসিদ্ধ। পুরাণে দিল্লীর নাম ইন্দ্রপ্রস্থ বলে। ইহাই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ছিল। পুরাতন কেল্লাকে এখন ইন্দ্রপ্রস্থ বলে। কিন্তু হিন্দুদের প্রাচীন রাজ্য কালের কোনও চিহ্ন আবিষ্কার করা হয় নাই। এই কেল্লার ভিতরে হুমায়ুনের পঠনালয়ের একটী মস্‌জিদ দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লীকে মহাশ্মশান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনঙ্গপালের এবং পৃথ্বীরাজের দুর্গ, কুতুবমিনারের নিকটের লাট (লৌহ স্তম্ভ) হিন্দু নরেন্দ্রের পূর্ব্ব স্মৃতিটুকু জাগরুক রাখিয়াছে। দুর্গ এবং দুর্গান্তর্গত রাজপ্রাসাদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

দেওয়ানে আম—এই বিশাল কামড়ায় শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভ আছে। ইহার ভিতরে উচ্চ চাতালের উপর স্থিত, সিংহাসনে বসিয়া সম্রাট নিজ প্রজার আবেদন-পত্র গ্রহণ করিতেন। এই কামরার আয়তন ১০০ × ৩০ বর্গমাইল।

দেওয়ানে খাস—ইহা লোক প্রসিদ্ধ। ইহা মর্ম্মর নির্ম্মিত এবং ইহার দেয়ালের উপরিভাগে সোনালী কাজ আছে। ইহার আয়তন ৯০ × ৯৭ ফিট। এই কামরার রুপার চাঁদওয়ায় সোনালী কাজ করা ছিল। ইহা তৈয়ার করিতে ৩৭ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল। সন্ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রেরা লুট করিয়া নিয়া ইহা গালাইয়া ফেলিয়াছিল এবং ইহার দাম [গালান অবস্থায়] ২৮ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। দেওয়ান খাসে জগৎ প্রসিদ্ধ ময়ূর সিংহাসন (যাহাকে এদেশের লোকেরা মুসলমানী ভাষায় "তখ্‌ততাউস" বলে) ছিল। এই সিংহাসনটী তৈয়ার করিতে সাত বৎসর সময় লাগিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারেন নাই যে, এই সিংহাসন তৈয়ার করিতে কত টাকা খরচ হইয়াছিল। কিন্তু টবর্ণিয়ার বলিয়াছেন যে সাড়ে নয় কোটী টাকার কম ইহা কিছুতে তৈয়ার হইতে পারে না। এই দেওয়াণ খাসে অনেক রকম কীর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। শাহজাহানের এইটী বড় পেয়ারের কামরা ছিল। সন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাটকে আরোগ্য করিয়া ডাক্তার হেমিল্টান (Dr. Hamilton) এই কামরায় ইংরাজদের জন্য সহরে ৩৮টী কোঠী খুলিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই হইতেই এদেশে ইংরাজ প্রভুত্বের সূত্রপাত হইল।

এই কামরাতেই গুলাম কাদির সম্রাট সাহ আলমের চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিল। এই কামরাতেই লর্ড লেক (Lord Lake) সেঁধিয়ার উৎপাত হইতে সম্রাটকে রক্ষা করিবার জন্য সম্রাটের নিকট হইতে ধন্যবাদ পাইয়াছিল। সন ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে এই কামরায় বিদ্রোহী সিপায়েরা অন্য বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। এবং সাত মাস পরে এই কামরায় সেই বাহাদুর শাহের বিপক্ষে বিদ্রোহ করিবার বিচার করা হইয়াছিল।

কেল্লার ভিতরে রঙ্গমহল হম্মাম ইত্যাদি দেখিবার উপযুক্ত। হাম্মাম দেখিলেই বোধ হয় যে ভারতবর্ষের শিল্প বিদ্যা কত উচ্চ দরের ছিল।

জুমা মস্‌জিদ—শাহজাহান এই মস্‌জিদ তৈয়ার করাইয়াছিলেন। ইহা একটী বৃহৎ মসজিদ, ইহার দালান প্রশস্ত, উচ্চ এবং খুব বড়। ইহার তিনটী গম্বুজ শ্বেত পাথরের

নির্ম্মিত এবং ইহার গায়ে সমান অন্তরে কাল পাথরের ধারী দেওয়া আছে। ইহার তুল্য অট্টালিকা ভারতবর্ষে খুব কম। দিল্লীতে জৈন মন্দিরের শিল্প দেখিবার উপযুক্ত। পুরাতন বাগানের মধ্যে কুরসীয়াবাদ দর্শক বৃন্দের মন হরণ করে।

রোশন আরা বাগানটিও অতি সুন্দর।

দিল্লীতে দেখিবার উপযুক্ত স্থান ও অট্টালিকা অধিক। অতএব সকলগুলিই অল্প দিনে দেখা অসম্ভব। দিল্লীতে কুতুবমীনার একটী প্রধান দৃশ্য। ইহা ২৩৮ ফিট উচ্চ! পৃথিবীর ভিতর ইহার তুল্য স্তম্ভ আর নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ফ্রান্সের কেম্পনাইল (Kampanail) ইহা অপেক্ষা ৩০ ফিট অধিক উচ্চ কিন্তু সৌন্দর্য্যে কুতুবমিনারই শ্রেষ্ঠ। কেহ কেহ ইহাকে কোনও হিন্দুরাজার কীর্ত্তি বলিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইহাতে ৩৭৮টী সোপান (সিঁড়ি) আছে। কুতুবমীনার যে স্থানে আছে তাহার চারিদিকে প্রাচীন কালের হিন্দুদের কীর্ত্তি চিহ্ন কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল হিন্দু ও অহিন্দু চিহ্নের মধ্যে আল্তামাসের সমাধি ও অলাই দরজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিল্লীর কীর্ত্তিগুলি মুসলমান রাজত্ব সময়ের হইলেও মনোযোগ দিয়া দেখিলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হিন্দু নগরের ধ্বংশ-স্তুপের উপর মুসলমানের কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। অর্থাৎ তাণ্ডব নৃত্য করা হইয়াছে। কিন্তু কালচক্রে তাহাও আজ শ্মশানে পরিণত।

যে স্থানে বিজয়ী বীরেরা কালজয়ী কীর্ত্তির রচনা করিবার আশা করিয়াছিল, সেই স্থানে, সেই ধ্বংশাবশেষের মাঝে বসিয়া যেন কাল মনুষ্যের শক্তির উপহাস করিতেছে, আর বুঝাইয়া দিতেছে যে মনুষ্যের শক্তির সীমা কতদূর হইতে পারে।

কুতুবমীনারের নিকটে দিল্লীর বিখ্যাত লাট (লৌহ স্তম্ভ) আছে। ইহা ভারতের হিন্দু রাজাদের নির্ম্মিত ও স্থাপিত, ইহা তাঁহাদের গৌরবের স্মৃতি চিহ্ন। পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহা তৈয়ার করা হইয়াছিল। ইহার লিপি পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে চন্দ্র রাজা, বিষ্ণুর নামে এই লৌহ স্তম্ভটীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইহা আনুমানিক ২৩ ফিট ৯ ইঞ্চি উচ্চ হইবে। ইহার শিখরে গরুড়ের মূর্ত্তি আছে। এই স্তম্ভটী যে সময়ে প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সে সময়ে পাশ্চাত্য দেশ ইহা অনুমানও করিতে পারে নাই যে লৌহ দ্বারা এরূপভাবে পরিষ্কার শুদ্ধ করিয়া এমন থাম তৈয়ার করা যাইতে পারে। ইহার দ্বারায় প্রমাণ হয় যে সেই সময়ে ভারতে লৌহ-শিল্প ও খুব উন্নত ছিল।

দিল্লীর বাহিরে নিজামুদ্দিন আলিয়ার স্থান ও সমাধি আছে। ইহার সমাধির সহিত আর কতকগুলি সমাধি আছে। সেই সকল সমাধির মধ্যে শাহজাহানের কন্যার সমাধি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার সমীপে কবি আমীর খুসরোর সমাধি। ইহার একটু দূরে ৬৪টি থামওয়ালা একটী কামরা আছে, ইহা সমস্তই শ্বেত পাথরের তৈয়ারী। ষ্টেশনের নিকটেই ধর্ম্মশালা আছে।

মথুরা ও বৃন্দাবন।

ই, আই রেলওয়ের (E. I. Ry) হাথরাস জংসন ষ্টেশন হইতে বী, বী, সী আই রেলের (B. B. C. I. Ry) গাড়ীতে উঠিয়া মথুরা ষ্টেশনে যাইতে হয়, মথুরা—জী, আই, পী, (G. I. P.) ও বী, বী, সী, আই, B. B C. I. রেলওয়ের জংসন ষ্টেশন হইতে মথুরানগর প্রায় দুই মাইল দূরে। নগরে বাঙ্গালী ঘাট ও স্থানে স্থানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে। পাণ্ডারাও যাত্রীদের থাকিবার স্থান দেয়। বৃন্দাবন হইতে মথুরা ৮ মাইল দূরে। বী, বী, সী, আই, লাইনও গিয়াছে। যাত্রীরা সচরাচর মোটর (motor) ও ঘোড়ার গাড়ীতেই মথুরা হইতে বৃন্দাবনে যাতায়াত করে। শ্রীবৃন্দাবন ষ্টেশন হইতে তীর্থ প্রায় এক মাইল দূরে। এখানেও ধর্ম্মশালা আছে। মথুরা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, পুরাণে বিখ্যাত ও প্রাচীন নগর। এই নগরটী ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত। শ্রীকৃষ্ণের যে মধুর প্রেমলীলা আজও ভারতের নরনারীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যাহার প্রতিধ্বনি আজও ভারতের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইতেছে, এই সেই মধুর প্রেমের লীলাভূমি মথুরা। মথুরা যমুনার তটের উপর বিরাজিত। যমুনার ঘাটের একটী স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে। মথুরার ঘাটের ভিতর বিশ্রাম ঘাট সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

আরতি—এই ঘাটের সন্ধ্যার আরতি দেখিতে অতি সুন্দর। প্রতিদিন শত শত লোক এই আরতি দেখিতে আসে। যেমন কাশীতে শ্রীবিশ্বনাথের আরতি একটী প্রসিদ্ধ দৃশ্য, সেইরূপ এই ঘাটের সন্ধ্যা আরতির শোভাও অতি মনোরম। সকল অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আরতির সময় বহু কচ্ছপ একত্রিত হয় এবং আরতি শেষ হইবামাত্র চলিয়া যায়। উহাদের খাবার দেওয়া হয়। বিশ্রাম ঘাটের নিকট একটী স্তম্ভ আছে, ইহাকে সতী স্তম্ভ বলে। প্রবাদ আছে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ কংসকে বধ করিবার পর, কংসের রাণীরা বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার জন্য এই স্থানে একত্রিত হইয়া চিতারোহণ করিয়াছিলেন। মথুরায় কেশবের মন্দির প্রসিদ্ধ ছিল। ঔরঙ্গজেব এই মন্দির ভাঙ্গিয়া এই স্থানে লাল পাথরের মস্‌জিদ তৈয়ার করাইয়াছিলেন। এখন প্রমাণ হইতেছে যে কেশবের মন্দিরও পুরাতন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংশাবশেষের উপর নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। মথুরায় বৌদ্ধদের সময়ের অনেক জিনিষ পাওয়া যায়। মথুরা বৌদ্ধ যুগেতেও প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু মুসলমানেরা উহার প্রসিদ্ধির চিহ্ন সকল নষ্ট করিয়া দিয়াছে। আজকাল সেই সকল চিহ্ন ভুগর্ভ হইতে খনন করিয়া বাহির করা হইতেছে। মথুরার ঘাটে আরও অনেকগুলি দেখিবার জিনিষ আছে। যথা :—

(১) যমুনাবাগের ছত্‌রী (ছাতা)
(২) হোলী দরজা (ফটক)
(৩) শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির।
(৪) বিজয়গোবিন্দের মন্দির।
(৫) মদনমোহন মন্দির।
(৬) দীর্ঘ বিষ্ণু মন্দির।
(৭) গোবর্দ্ধন ঘাটের মন্দির।
(৮) বিহারী জিউর মন্দির।
(৯) মোহন জিউর মন্দির।

Bisram Ghat—Muttra.
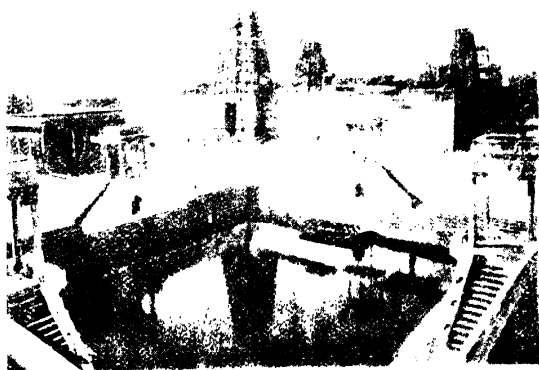
ঘাট—মথুরা ।

विश्राम घाट—मथुरा ।

Ranjika Temple—Brindabun.

মন্দির—বৃন্দাবন

मन्दिर—वृन्दावन ।

মথুরা হইতে বৃন্দাবন অল্প দূরে। লাইট রেলওয়ে (Light Railway) অথবা ঘোড়ার গাড়ীতে মথুরা হইতে বৃন্দাবনে যাইতে হয়। মথুরা ভগবানের লীলাভূমি। পৌরাণিক কালে কবির কল্পনায় বৃন্দাবন অতি মনোরম স্থান ছিল। গোপবালকের শিঙ্গারবে বৃন্দাবন মুখরিত হইত। বিশালাক্ষী গোপ-বধুটীর প্রমোচ্ছ্বাসে বৃন্দাবনের ধূলিকণা পর্য্যন্ত প্রেমময় হইত। এই বৃন্দাবন ভক্তবৃন্দের কাম্যস্থান। বৃন্দাবনের তরুলতা পর্য্যন্ত কৃষ্ণ প্রেমের সুধারসে বিভোর হইয়া থাকিত। ভক্তদের এই বিশ্বাস যে বৃন্দাবনের ধূলিকণা স্পর্শ করিলেই মনুষ্য মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। হিন্দু ধর্ম্মানুসারে অনেক প্রকার ভক্তি আছে। সাধারণ ও সরলভাবে ইহা শান্ত। কিন্তু অন্যভাবে ভক্তি ক্রিয়া হীন। ক্রিয়াযুক্ত ভাবে ভক্তির চারি প্রকার রস ও রীতি আছে। যথাঃ—

(১) দাসভাবাপন্ন। ২। সখ্যভাব, ভীমার্জ্জুনের অনুভাব। ৩। যশোদা আদির অনুভাবে বাৎসল্যভাব। ৪। ব্রজগোপীর অনুভাবে মাধুর্য্যভাব। বৃন্দাবন গোপীদিগের এই ভক্তি ভাবের উত্তম ভূমী। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। ব্রজমণ্ডলে জীব হত্যা করা নিষিদ্ধ। বন্য জন্তুগণ নিঃশঙ্কচিত্তে মথুরায় বিচরণ করিতেছে। বৃন্দাবনও যমুনার ধারে ছিল, কিন্তু এখন যমুনা বৃন্দাবন হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। আজকাল যমুনার গতি আবার বৃন্দাবনের দিকে আনিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের শত মন্দিরের ভিতর তিনটী প্রধান ১। গোবিন্দ জিউর মন্দির। ২। গোবিন্দ জিউর পুরাতন মন্দির, ইহা লাল পাথরের তৈয়ারী। লর্ড নর্থকেক বলিয়া গিয়াছেন, "সমগ্র পশ্চিমোত্তর ভারতে এরূপ সুন্দর মন্দির নাই। আওরংজেব এই মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। গোবর্দ্ধনে হরদেব জিউর মন্দিরও অতি সুন্দর, পুরাতন-শিল্প রক্ষানুরাগী লর্ডকার্জ্জনের চেষ্টায় ইহার মেরামত হইয়া গিয়াছে, আওরংজেব যে সময় মন্দির ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সময় গোবিন্দ জিউর বিগ্রহ জয়পুরে রক্ষা করা হইয়াছিল। ৩। যমুনায় তটে একটী উচ্চ স্তূপের উপর মদন মোহনের মন্দির আছে। ইহা দক্ষিণ ভারতের শিল্পবিদ্যার পদ্ধতিতে নির্ম্মিত।" গোবিন্দ জিউর ও মদনমোহন জিউর মূর্ত্তিদ্বয় একটী ছোট মন্দিরের ভিতর আছে। লক্ষ লক্ষ লোক এখানে দর্শন করিতে আসে। কিন্তু অনেকেই নিজের সংসার ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করে। এখানে ভক্তদের জন্য আরও কতকগুলি মন্দির আছে। মথুরায় সেঠজিউর মন্দির দেখিতে কেল্লার মত এবং অতি সুন্দর। এই মন্দিরের প্রাঙ্গনে গরুড় স্তম্ভ আছে। ইহাকে লোকে সোনার তাল গাছ বলিয়া থাকে। এই মন্দিরের অধীনে অনেক ঐশ্বর্য্য আছে। ইহার পর শাহ জিউর মন্দির।

শাহ জিউর মন্দির সমস্ত সাদা পাথরে তৈয়ারী, ইহার সৌন্দর্য্য অতি কোমল ও মধুর, ইহার প্রবেশ ভাগের উচ্চতা দেখিলে রোমের সেণ্ট পীটার্স বাগ (St. Piters Bargh of Rome) মনে পড়ে।

লালাবাবুর কুঞ্জ—বঙ্গদেশের পাইক পাড়ার প্রসিদ্ধ রাজবংশের লালাবাবু গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ইহা লালাবাবুর কুঞ্জ বলিয়া বিখ্যাত।

ব্রহ্মচারী কুঞ্জ—বৃন্দাবনে ভারতের রাজাদেরও অনেকগুলি মন্দির আছে, তাহার মধ্যে গোয়ালিয়রের মহারাজার "ব্রহ্মচারী-কুঞ্জ" ও জয়পুর মহারাজার নূতন মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বঙ্কুবিহারীর মন্দিরে বিশেষ ভীড় হয়। বৃন্দাবন বঙ্গদেশ হইতে অনেক দূরে তবুও বঙ্গবাসী বাঙ্গালীরা বৃন্দাবনের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ করিয়া লইয়াছেন। অন্য প্রান্তের লোক অপেক্ষা বঙ্গদেশের লোক বেশী। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের লীলা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে। কোথাও পার্থ সারথীর রূপে, আর কোথাও বা পাণ্ডব সখার রূপে কিন্তু মাধুর্য্যের অবতার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ দ্বিভুজ মূরলীধর মূর্ত্তি শুধু বঙ্গবাসীর হৃদয় রূপী বৃন্দাবনেই বিরাজ করিতেছেন এবং তিনি বঙ্গদেশে সত্য সনাতন রূপে বিদ্যমান। বঙ্গের সুগভীর বৈষ্ণব সাহিত্য গোপী প্রেমে রঞ্জিত। অধিকাংশ বাঙ্গালী বৃন্দাবনে কুঞ্জ (গৃহ) প্রস্তুত করিয়া রাধাকৃষ্ণের মন্দির স্থাপনা করিয়াছেন এবং ইহার সহিত অনেকগুলি অন্ন ছত্রও আছে। সেই জন্য বৃন্দাবনে কেহই উপবাসী থাকে না। ছত্রের প্রবন্ধ করিবার প্রধান কারণ এই যে লোকে নিশ্চিন্ত হইয়া দেবার্চ্চনা করিবে ও ধর্ম্মচর্চ্চায় আপন আপন মননিবেশ করিবে। কিন্তু উক্ত আশ্রমে আজকাল কুঁড়ে লোকেদের সংখ্যাই অধিক হইয়া পড়িয়াছে।

বৃন্দাবনে—জলের ভিতর কচ্ছপের পল্টন এবং গাছের উপর বানরের যুদ্ধ, ইহাদিগের উৎপাতে বৃন্দাবনবাসীদের বা যাত্রীদের উৎখাস্ত হইতে হয়। কিন্তু ব্রজমণ্ডলে জীব হিংসা করা নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ ইহাদের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশও করিতে পারে না।

পুরাণে যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের লীলা বর্ণিত আছে, সেই ভাবেই এখানে তাহার অনুষ্ঠান করা হয়। বৃন্দাবন মাধুর্য্যের লীলাক্ষেত্র। ইহার সৌন্দর্য্য বৃহৎ অট্টালিকার সৌন্দর্য্যের উপর নির্ভর করে না, বরং বনের সৌন্দর্য্যেই ইহার সৌন্দর্য্য।

জন্মাষ্টমীর পর ভক্তগণ "বন ভ্রমণে" অর্থাৎ বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তি বন সমূহে যাত্রা করিয়া থাকে। ইহাও একটী মহৎ উৎসব।

মথুরায় "মহাবনে" যাইতে হয়। মহাবনের কিছু দূরেই "গোকুল" এই স্থানের একটী স্থান দেখাইয়া যাত্রীদের বলা হয় যে, এইটী নন্দ রাজার রাজভবন। গোকুলের ঘাট বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ীদের পরম তীর্থ স্থান। বৃন্দাবনের নিকটেই বলরামের প্রসিদ্ধ স্থান। কিন্তু গোবর্দ্ধন ও রাধা কুণ্ডও প্রসিদ্ধ। গিরি গোবর্দ্ধন যে শৈলমালার উপরে অবস্থিত, তাহাকেই "গিরিরাজ" বলে। গোবর্দ্ধন গ্রাম মানসী-গঙ্গা নামক সরোবরের তটে অবস্থিত। গোবর্দ্ধন হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে শ্যাম ও রাধাকুণ্ড। বৃন্দাবন হইতে কিছু দূরে "বরসনা" ও ডীগ বলিয়া দুইটী প্রসিদ্ধ স্থান আছে। বরসনা স্থানটী শ্রীরাধার জন্মস্থান বলিয়া প্রখ্যাত।

মথুরা সহরের ভিতরকার দেব মন্দির ও স্থান—

১। যমুনা।
২। গতাশ্রম নারায়ণ।
৩। দ্বারকাধীশ।
৪। বারাহী জিউর মন্দির।
৫। গোবিন্দ জিউর মন্দির।
৬। বিহারী জিউর মন্দির।
৭। গোবর্দ্ধননাথের মন্দির।
৮। গোপিনাথ জিউর মন্দির।
৯। মথুরানাথ জিউর মন্দির।
১০। দাউ জিউর মন্দির।
১১। ব্রজগোবিন্দের মন্দির।
১২। গোবর্দ্ধননাথের অন্য মন্দির।
১৩। রাধাকৃষ্ণের মন্দির।
১৪। মাদলী মাতা।

মথুরার পরিক্রমা ১০ মাইল। বিশ্রাম ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া ৬ ছয় ঘণ্টায় সেই স্থানে আসিয়া শেষ করিতে হয়। পরিক্রমা করিতে হইলে নিম্নলিখিত স্থানগুলি রাস্তায় পড়ে।

১। বিশ্রামঘাট—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কংশকে বধ করিয়া এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন।
২। বলভদ্র ঘাট।
৩। যোগ ঘাট—এইস্থানে পিপ্পলেশ্বর মহাদেব আছেন।
৪। প্রয়াগঘাট—এখানে বেণীমাধবের মূর্ত্তি আছে।
৫। রাজঘাট—এখানে রামেশ্বর মহাদেব আছেন।
৬। শ্যামঘাট—এখানে কংখল ক্ষেত্র ও তিন্দুক নামক তীর্থ আছে।
৭। বাঙ্গালীঘাট।
৮। সূর্য্যঘাট।
৯। ধ্রুবঘাট—এখানে পিণ্ডদান করা হয়।
১০। মোক্ষতীর্থ ও সপ্ত ঋষির স্তুপ।
১১। রাজা বলীর স্তুপ (এই স্তুপ হইতে কাল কাঁকড় বাহির হয়)।
১২। রাবণের স্তুপ (এখানে রাবণ তপস্যা করিয়াছিল)
১৩। কৃষ্ণ ও কুব্জা।
১৪। রঙ্গ ভূমী।
১৫। গোপাল জিউর মন্দির।
১৬। ভূতেশ্বর মহাদেব।
১৭। পোড়বা কুণ্ড।
১৮। কেশব দেবের মন্দির।
১৯। মহাবিদ্যা দেবীর মন্দির।
২০। সরস্বতী কুণ্ড।
২১। চণ্ডি দেবী।
২২। গোকর্ণেশ্বর মহাদেব।
২৩। অম্বঋষির স্তুপ।
২৪। দশাশ্বমেধ ঘাট।
২৫। চক্রতীর্থ।
২৬। কৃষ্ণ-গঙ্গা ঘাট।
২৭। রাধাপত্তন ঘাট।
২৮। সোম ঘাট।
২৯। কংসের কেল্লা।
৩০। বসুদেব ঘাট।
৩১। বৈকুণ্ঠ ঘাট।
৩২। গৌঘাট।
৩৩। অসী কুণ্ড ঘাট।

ব্রজমণ্ডল—মথুরার নিকটবর্ত্তী ৮৪ ক্রোশের ঘেরা এবং সেই ঘেরাটীকে ব্রজ-মণ্ডল বলে। ব্রজের পরিক্রমা ভাদ্রমাসের একাদশী হইতে আরম্ভ হয়। ব্রজে ১২টী বন ২টী উপবন, ৫টী পর্ব্বত, ১১টী কূপ, ৮৪টী কুণ্ড, ২টী হ্রদ, ২টী ধারায় স্নান, ৭টী বলরাম, ৯টী দেবী, এবং ১০টী মহাদেব আছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

শ্রীবৃন্দাবনে দেখিবার যোগ্য স্থান।

১। গোবিন্দজিউ।	৫। রাধাদামোদর।	৯। রাধাবল্লভ।
২। গোপীনাথ।	৬। রাধাবিনোদ।	১০। বঙ্কুবিহারী।
৩। মদনমোহন।	৭। শ্যাম সুন্দর।	১১। পৌর্ণমাসি।
৪। রাধারমণ।	৮। গোকুলানন্দ।	১২। নিকুঞ্জবন।

নিকুঞ্জবন—এইস্থান রাধাকৃষ্ণের নিত্য-বিহারের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই বনের ভিতর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজের মোহন বংশীর দ্বারায় প্রিয় সখি ললিতার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে একটী তমাল বৃক্ষের গায়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যশোদার ভয়ে মাখমের হাত মুছিয়া ছিলেন। পাণ্ডারা সেই দাগ যাত্রীদের এখনও দেখায়।

(১৩) **নিধুবন**—এই বনে শ্রীরাধিকা রাজা সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারী করিয়াছিলেন। এবং এই বনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ বংশীর দ্বারায় বিশাখা নামের একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন।

(১৪) সাওজিউর মন্দির—বৃন্দাবনের ভিতর এই মন্দিরটীই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং ইহার স্থাপিত মূর্ত্তিটীও অতি সুন্দর।

(১৫) সেঠজিউর মন্দির।

(১৬) ব্রহ্মচারির মন্দির।

(১৭) বংশীবট—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বংশী বাজাইয়া রাস লীলা করিয়াছিলেন।

(১৮) গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির—যে সময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রাসলীলা করিয়াছিলেন, সেই সময় দেবাদিদেব মহাদেব গোপীনীর রূপ ধারণ করিয়া, লুকাইয়া রাসলীলা দেখিয়াছিলেন, সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ইহার নাম গোপেশ্বর ঘাট রাখিয়াছিলেন।

(১৯) লালাবাবুর কুঞ্জ।	(২৫) পুরেমু ঘাট।
(২০) মহারাণী টিকারীর মন্দির।	(২৬) যুগল ঘাট
(২১) ব্রহ্ম কুণ্ড।	(২৭) বিহার ঘাট।
(২২) যোগভাব।	(২৮) আঁধার ঘাট।
(২৩) অক্রুর তীর্থ।	(২৯) শৃঙ্গার ঘাট।
(২৪) দ্বাদশ ঘাট।	(৩০) বস্ত্রহরণ ঘাট।
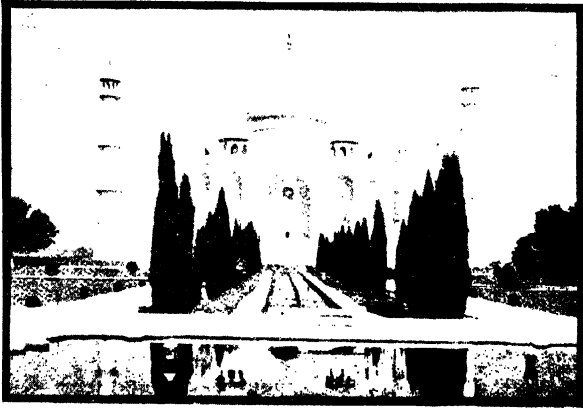
Tajmahal.

তাজমহল | ताजमहल ।
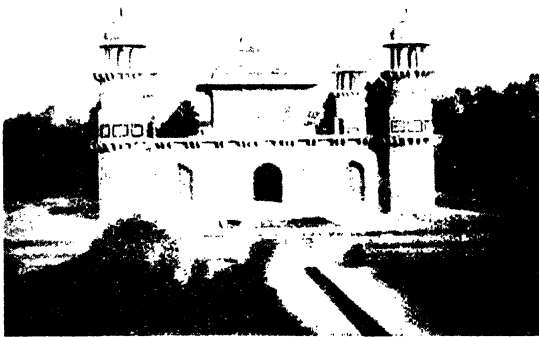
Itmaratdaulla—Agra.

ইত্মারতদৌলা—আগরা । | इतमारतदौला—ग्रागरा
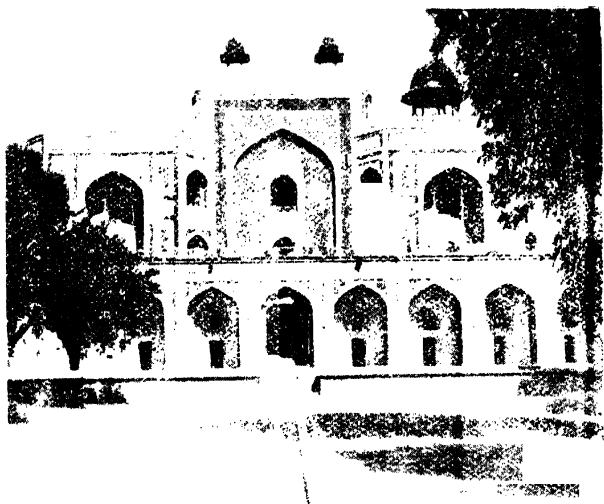
জিদ ফতেপুরী—দিল্লী। Majit Fatepuri—De মাজিত ফতপুরী—দিল্লি।
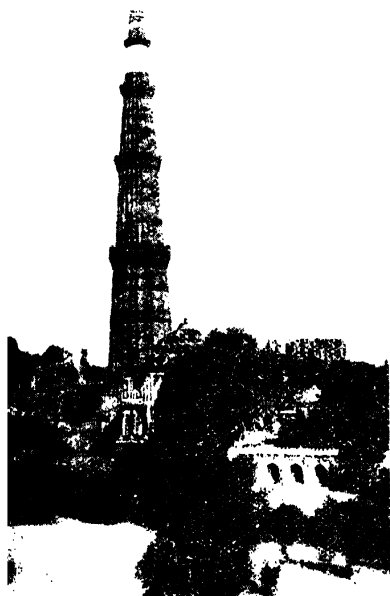
নার—দিল্লি। Kutubminar—De

শ্রীনাথ দোয়ারা Sreenath Dwa

(৩১) কালিয়দমন ঘাট (এখানে কৃষ্ণচন্দ্র কালীনাগকে দমন করিয়াছিলেন)।

(৩২) গোপাল ঘাট।

(৩৩) সূর্য্য ঘাট।

(৩৪) ভ্রমর ঘাট।

(৩৫) কেশী ঘাট।

(৩৬) রাজঘাট।

ঝুলন—শ্রাবণ মাসের শুক্লা তৃতীয়া হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমার দিন পর্য্যন্ত হয়। এখানকার দোল যাত্রা ও হোলী খুব প্রসিদ্ধ।

আগরা।

আগরা ফোর্ট ষ্টেশন (Agra fort station) জী, আই, পী, (G. I. P. Ry) বী, বী, সী, আই (B. B. C. I. Ry) ও ই, আই, আর (E. I. Ry) রেলের জংসন। ষ্টেশনের নিকটেই ধর্ম্মশালা আছে। সহরের ভিতর অনেকগুলি হোটেল, ডাকবাঙ্গলা ও ধর্ম্মশালা আছে। প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট আকবর এই নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহাকে মোগলদের লীলা ভূমি, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক, এই নগরটীকে সম্রাট শাহজাহান প্রসিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাজবিবির কবরের জন্য অর্থাৎ তাজমহলের জন্য বিখ্যাত। যমুনার স্নিগ্ধ নীল জলের ধারে শ্বেত পাথরের ধবল অট্টালিকা তাজমহলের জোড়া এ জগতে আর নাই। শাহজাহান নুরজাহানের ভাই আশা খাঁর কন্যা নুরমহলকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সে সময় নুরমহল ১৯ বৎসরের কন্যা ছিল। এবং শাহজাহান ২১ বৎসরের বালক ছিলেন। স্বামীর সহিত যুদ্ধে গিয়া বরহানপুরে নুরমহলের মৃত্যু হয়, এই নুরমহল মমতাজমহল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। শোকার্ত্ত শাহজাহানের আজ্ঞায় তাঁহার প্রিয়তমার মৃতদেহ আগরায় আনা হয়। প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতি রক্ষার জন্য শাহজাহান চার কোটি টাকা খরচ করিয়া তাজমহল প্রস্তুত করেন। ২০ হাজার মজুর ১৭ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ইহা তৈয়ার করে। তাজমহল বাস্তবিকই প্রেমের মর্ম্মর রচিত স্বপ্ন।

শাহজাহান যে সময় এই অট্টালিকাটী প্রস্তুত করিবার মানস করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তিনি ইহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবেন, ইহাই তাহার লক্ষ্য ছিল। দিল্লী, বোগদাদ মুলতান, সমরকন্দ, সিরাজ প্রভৃতি স্থান হইতে শিল্পকুশল লোক আনা হইয়াছিল। জয়পুর, পাঞ্জাব,চীন, তিব্বত, শিংহল,আরব,পান্না, ঈরাণ এই সকল শিল্প-প্রসিদ্ধ দেশ হইতে নানাপ্রকার বস্তু সংগ্রহ করা হইয়াছিল। এই সকল বস্তুর মধ্যে সোনা, রূপা মনি মণিক্যের কিছুই অভাব ছিল না। কবরটী মূল্যবান মুক্তার ঝালর দিয়া ঢাকা হইয়াছিল। সেই সকল মূল্যবান জিনিষ সমস্তই লুট হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র তাজমহলই অবশিষ্ট আছে। ভারতের শিল্পকলাই শাহজাহানের প্রেমের প্রমাণ। তাজমহলটি কবিতার অনুভব, বর্ণনদ্বারায় বুঝান যাইতে পারে না। তাজমহল কেবল অট্টালিকা মাত্র নহে, কল্পনার স্বপ্ন নহে। উহা একটী হৃদয়ের

গভীর ভাবের বিকাশ। ইহার বিশেষত্ব উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখিলে বুঝা যায়। তাজমহল দেখিতে ইউরোপ (Europe), আমেরিকা (America) হইতে যাত্রিগণ ভারতে আসিয়া থাকেন। তাজের প্রবেশের তোরণটীও তাজেরই উপযুক্ত।

যমুনার পরপারে ইতিমাতুদ্দৌলার সমাধি আছে। ইতিমাতুদ্দৌলা নুরজাহান বেগমের পিতা ছিলেন। এই সমাধি অট্টালিকা নুরজাহান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাজের অতিরিক্ত জুম্মা-মস্‌জিদ ইতিমাতুদ্দৌলার কবর; সিকান্দরায় সম্রাট অওরঙ্গজেবের কবর, আকবর কেল্লা ইত্যাদি অনেক দেখিবার স্থান আছে।

কেল্লার ভিতর দেখিবার জিনিষ - মোতী মস্‌জিদ, দেওয়ানে আম, আকবরের দরবার নগীনা মস্‌জিদ, শাহজাহানের বন্দি গৃহ, মীনা বাজার, মাছী ভবন, দেওয়ানে খাস, কাল পাথরের সুন্দর আসন, সোমনাথের দরজা, শীশ মহল; হাম্মাম, (স্নান করিবার স্থান) জাহাঙ্গীর মহল, আকবরের পঠনাগার ইত্যাদি দেখিবার উপযুক্ত। ৵০ আনা পয়সা দিলে কেল্লায় যাইবার জন্য কেণ্টোনমেণ্ট মেজিষ্ট্রেটের (Cantonement Magistrate) নিকট হইতে টিকিট পাওয়া যায়।

লক্ষ্ণৌ

লক্ষ্ণৌ সহর গোমতী নদীর কিনারায়। ইহা ই, আই, রেলের (E. I. Ry.) একটী প্রসিদ্ধ ষ্টেশন। মোগলসরাই হইতে ইহা প্রায় ১৯২ মাইল। প্রবাদ আছে যে, বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌ সহর যে স্থানটীকে বলা হয়, সেই স্থানেই শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত অনুজ লক্ষ্মণ নিজ পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌ নগরটী অধিক দিনের নহে। এই সহরটীকে অযোধ্যার নবাবেরা গুলজার করিয়াছিল। সেই সকল নবাবদের মধ্যে তিনজনের রাজধানী ফয়জাবাদে ছিল। নবাব আসিফুদ্দৌলা নিজ রাজধানী ফয়জাবাদ হইতে তুলিয়া এই স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। আসিফুদ্দৌলাই এখানে দৌলতখানা, মহল, ইমামবাড়ী এবং মস্‌জিদ রূপী-দরজা খুর্শেদি মঞ্জিল প্রভৃতি তৈয়ার করাইয়াছিলেন। সন ১৭৮৭তে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য নবাব আসিফুদ্দৌলা ইমাম বাড়াটী তৈয়ার করাইয়াছিলেন। মচ্ছিভবন ইহার পূর্ব্বে করা হইয়াছিল। নবাব সাদত আলী মোতী মহল দিলকুশা ও লাল বারদরী এবং রেসিডেন্সির ভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই বংশের শেষ নবাব ওয়াজিদ আলীশাহ কৈশর বাগের বিলাস ভবন ৮০ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া তৈয়ার করাইয়াছিলেন। তিন শত রূপসী বেগম লইয়া বিলাসভবনে আনন্দে নিমগ্ন থাকায় রাজকার্য্য কিছুমাত্র দেখিতে পারিতেন না। তখন ইংরাজেরা উহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া কলিকাতার উপনগর মেটেবুরুজে নজরবন্দি করিয়া রাখিল।

নবাব নসীরউদ্দিন নিজ বেগমদের জন্য ছত্র মঞ্জিল নামের রাজভবন তৈয়ার করাইয়াছিলেন। ঐ ভবনের মাথার উপর একটি ছাতা আছে বলিয়া উহার নাম ছত্রমঞ্জিল হইল।

বিলাসের প্রবাহে অযোধ্যার নবাবদিগের বংশ যে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার সন্ধান আর ইহ জগতে মিলিবে না। নর্ম্মদার কূলে সুন্দর অট্টালিকাগুলি কেবলমাত্র মনুষ্যের কর্ম্মের অস্তিত্বের খেদজনক সাক্ষী দিতেছে। যুক্ত প্রান্তের অন্যতম রাজধানীরূপে লক্ষ্ণৌ আজকাল এলাহাবাদের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে।

অযোধ্যা।

মোগলসরাই হইতে লক্ষ্ণৌ যাইবার রাস্তায় ই, আই, আর, এল লাইনের অন্তর্গত অযোধ্যা ষ্টেশন। রামায়ণের প্রধান কেন্দ্র স্থল অযোধ্যা সরযূ ফয়জাবাদ হইতে অযোধ্যায় যাইবার পথে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানের মন্দির দৃষ্ট হয়।

অযোধ্যায় ৯৬টী দেব-মন্দির আছে। ইহার ভিতর ৬৩টী বৈষ্ণবদের মন্দির এবং ৩৬টী শৈব-মন্দির। ৩৬টী মস্‌জিদ ছিল। লক্ষ্মণ ঘাট হইতে একটু দূরে ৯০ ফিট উচ্চ একটী স্তুপের উপর জৈনদের আদিনাথের মন্দির। কনক ভবন, রাজা দর্শন সিংহের শিব-মন্দির এবং হনুমান গঢ়ী এখানকার মন্দিরের ভিতর শ্রেষ্ঠ। অযোধ্যায় বৈষ্ণবদের অনেক মঠ আছে।

চৈত্র মাসের রামনবমীর দিন অযোধ্যায় একটী বড় মেলা হয়, ইহাতে প্রায় ৫০০০০০ যাত্রী সমাবেশ হয়। যাত্রীরা সরযূর স্বর্গদ্বার ঘাটের উপর রামনবমীর দিন স্নান ও দান করিয়া থাকে। সরযূ নদীর প্রাধান্য এবং ইহার মাহাত্ম্য সকল স্থান অপেক্ষা অযোধ্যায়ই বেশী। যে স্থানে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উহাকে লোকে জন্মস্থান বলিয়া থাকে শ্রীরামচন্দ্রের প্রাচীন জন্ম-মন্দির ধ্বংস হইলে, ঐ স্থানে যে নূতন মন্দির তৈয়ার হইয়াছিল, তাহা ভারতের প্রথম মোগল সম্রাট বাবর, মস্‌জিদে পরিণত করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন ভবনের বাইরের থামগুলি কষ্টিপাথরের নির্ম্মিত। জন্মস্থানের পর স্বর্গদ্বার বা রামঘাট। এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের শব দাহন হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ ঘাট ঃ—লক্ষ্মণের স্নান করিবার জায়গায় ইহা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ইহার পর মণি পর্ব্বত, কুবের পর্ব্বত, সুগ্রীব পর্ব্বত এবং হনুমান গঢ়ী ইত্যাদি আছে।

অযোধ্যা দেখিবার উপযুক্ত স্থান। সরযূ নদীর ধারে রাম এবং লক্ষ্মণ ঘাট নাগেশ্বর মহাদেব, রাম-কোট, রামচন্দ্রের জন্মস্থান। অশ্বমেধ যজ্ঞভূমী ইত্যাদি দেখিবার যোগ্য ও অতি রমনীয় স্থান। ষ্টেশন হইতে অযোধ্যা সহর আড়াই মাইল দূরে। ষ্টেশনে অনেক রকমের গাড়ী পাওয়া যায়।

হরিদ্বার।

ই, আই, আর, (E. I. Ry.) লাইনে লক্‌সর জংসন দিয়া হরিদ্বার-দেরাডুন নামে একটী লাইন গিয়াছে। হরিদ্বার এই লাইনের অন্তর্গত। হরিদ্বার ষ্টেশনে এবং সহরের ভিতর অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে। ঋষিকেশ ও লছমন ঝোলায় যাইবার জন্য হরিদ্বারে সব সময়ে অনেক রকমের গাড়ী, মটর, পাল্কী ইত্যাদি পাওয়া যায়। শিবালিক পর্ব্বতের নিচে গঙ্গার দক্ষিণ তটে হরিদ্বার হিন্দুদিগের অত্যন্ত পবিত্র ও প্রাচীন তীর্থ। ইহার অপর নাম কপিল স্থান। যাত্রীরা গঙ্গাদ্বারে স্নান করিয়া পুণ্য লাভ করে। ইহার উপর বিষ্ণুর চরণ-চিহ্ন অঙ্কিত আছে। ইহাকে মায়া পুরী বলে। প্রতি বৎসর চৈত্র হইতে কার্ত্তিক অবধি স্নান আরম্ভ হয়। প্রতি ১২ বৎসরের পর কুম্ভ যোগ হয়। এই উপলক্ষে এখানে ৫।৬ লক্ষ লোক সমবেত হয়। হরিদ্বারে জীব হত্যা করা নিষেধ। যুগবর্ত্ত ঘাটে পিতৃতর্পণ করিতে হয়। এই স্থানে দক্ষেশ্বরের মন্দির আছে। ইনি সেই দক্ষপ্রজাপতি, যিনি শিবহীন যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে শিব নিন্দা শুনিয়া সতী নিজ দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সেই কারণে দক্ষ শিব কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়াছিলেন। যে স্থানে সতী দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই স্থানটী সতীকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। হরিদ্বারে তিনটী পুরাতন মন্দির আছে। নারায়ণ শিলা, মায়াদেবী ও ভৈরব। মায়াদেবীর মন্দিরের নিকটে পর্ব্বতের উপর বিল্বকেশ্বরের মন্দির আছে। মায়াদেবীর মন্দিরটী বহু প্রাচীন এবং পাথরের নির্ম্মিত।

গঙ্গার নামিবার স্থান বলিয়া হরিদ্বার হিন্দুদিগের অতি পবিত্র তীর্থ। হরিদ্বার হইতেই কেদার ও বদরিকাশ্রম যাইবার পথ। এখানে হরিপৈড়ী, কুশাবর্ত্ত, বিল্বক, নীলপর্ব্বত, ও কনখল এই পাঁচটী তীর্থই প্রধান।

(১) হরিপৈড়ী—হরিদ্বারের প্রধান ঘাটের নাম "হরিপৈড়ী" ঘাটে অবতরণ করিয়া দেয়ালের নীচে হরি অর্থাৎ বিষ্ণুর চরণ-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নিকট গঙ্গেশ্বর নামক দুইটী শিবলিঙ্গ আছে।

(২) কুশাবর্ত্ত—হরিপৈড়ী হইতে দক্ষিণে গঙ্গার যে স্থানে পাথর দিয়া বাঁধান একটী ঘাট আছে, সেই স্থানটীকে কুশাবর্ত্ত বলে।

(৩) শ্রবণনাথের মন্দির—হরিপৈড়ী হইতে প্রায় ৬০০ গজ দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, শ্রবণনাথ সন্ন্যাসীর নির্ম্মিত একটী শিব মন্দির আছে। হরিদ্বারের সমস্ত মন্দির অপেক্ষা ইহা সুন্দর। ইহার পূর্ব্ব ধারে কিনারায় মহারাজার নির্ম্মিত গঙ্গা মাতার শিখর দেওয়া বড় মন্দির আছে। এবং এই স্থানে মহারাজের তরফ হইতে সদাব্রত এখনও চলিতেছে।

(৪) বিল্বকেশ্বর—হরিপৈড়ী হইতে ১ মাইল পশ্চিমোত্তর পাহাড়ের নিম্নে একটী চত্বরের উপর অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থানে একটি বেলগাছ ছিল, বর্ত্তমানে একটি নীমগাছ

আছে। এই স্থানে একটী গুহার ভিতর বিল্বকেশ্বর শিবলিঙ্গ, দুর্গাদেবী ও গণেশের প্রতিমূর্ত্তি আছে। অন্যদিকে পাহাড়ের নীচে গৌরীকুণ্ড নামে একটী কুণ্ড আছে। লোকে ঐ কুণ্ডের জল দ্বারা আহ্নিক করে।

মায়াপুর—হরিদ্বার হইতে ১ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে গঙ্গার দক্ষিণদিকে, পবিত্র সপ্ত পুরীর মধ্যে একটী এবং হরিদ্বারের পুরাতন বসতি "মায়াপুরের" অবস্থা এখন অতি শোচনীয়। এখানে বহু পুরাতন তিনটী মন্দির আছে। পূর্ব্বোত্তরে জ্বালাপুর যাইবার রাস্তায় প্রথমটী "মায়াদেবীর" দ্বিতীয়টী ভৈরবের, তৃতীয়টী দক্ষিণ ও পশ্চিমে নারায়ণ-শিলার। মায়াদেবীর তিনটী মাথা এবং চারিটী হাত আছে। ইহার নিকটে অষ্টভুজ একটী শিবমূর্ত্তি আছে এবং বাহিরে নন্দী বসিয়া আছে।

নীলপর্ব্বত—মায়াপুর হইতে দক্ষিণে গঙ্গার উপর একটী কাঠের পোল আছে, সেই পোলটী পার হইয়া নীলপর্ব্বতে যাইতে হয়। নীলপর্ব্বত একটী ছোট পাহাড়, ইহার নিম্ন দিয়া গঙ্গার একটী স্রোত-ধারা চলিয়া গিয়াছে, সেই ধারাটীকে নীলধারা কহে। কখন কখন সেইটী শুকাইয়া যায়। এই স্থানেই নীলেশ্বর মহাদেব আছেন।

কনখল—হরিদ্বারে হরিপেড়ী হইতে ৩ মাইল দক্ষিণে একটী গ্রাম আছে, ইহাকে কনখল বলে। কনখল নামের একটী সুন্দর মানে আছে, কে এমন খল আছে যে, "এখানে স্নান করিলে তাহার মুক্তি হয় না"। দক্ষেশ্বর শিবের মন্দির এখানে প্রধান।

হৃষিকেশ, লছমনঝোলা ও বদ্রিনাথ।

হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশে যাইবার একটী সোজা রাস্তা আছে, এক্কা, টাঙ্গা, বয়েলগাড়ী, মোটার ইত্যাদি সকল রকম সোয়ারী-গাড়ী পাওয়া যায়। হরিদ্বারের মত এখানেও ঝাম্পান ও ডণ্ডিওয়ালা কুলি পাওয়া যায়। হৃষিকেশে গঙ্গার দক্ষিণদিকে রামসীতার মন্দির আছে। মন্দিরের সামনে "কুব্জা বউ" বলিয়া একটী পাকা কুণ্ড আছে। ঝরণার জল এই কুণ্ডের ভিতর দিয়া গঙ্গায় পড়ে। এখানে ভরত জিউর মন্দির, সকল মন্দির অপেক্ষা প্রধান। মন্দিরের ভিতর ভরত জিউর মূর্ত্তি, শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ, বিষ্ণুর মত শঙ্খ চক্র, গদা পদ্ম সংযুক্ত, শ্রীজগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য স্বহস্তে এই মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন। হৃষীকেশে বাবা কালীকমলী-ওয়ালার ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত বিখ্যাত। এই ধর্ম্মশালার নিয়মাদি অতি সুন্দর। ইহা ব্যতীত জগাত্রীওয়ালার, কলিকাতাওয়ালার ও আরও অনেক ধর্ম্মশালা আছে। গঙ্গার ধারে অনেক রকমের সাধু সন্ন্যাসী, বৈরাগী, ইত্যাদির কুটী তৈয়ার করিয়া বাস করিতেছেন। বাবা কালীকমলীওয়ালার ও অন্যান্য ধর্ম্মশালা হইতে প্রত্যহ সাধুদের রুটী, ডাল ইত্যাদি দেওয়া হয়। যদি কোনও যাত্রী ইচ্ছা করেন অবাধে এই সকল ধর্ম্মশালায় ভোজন করিতে পারেন। এই স্থান হইতেই লছমনঝোলা হইয়া শ্রীবদ্রীনাথ ও কেদারনাথ পাহাড়ে যাইবার পথ।

কেদার নাথ ও বদ্রিনাথের মন্দির হিমালয় পর্ব্বতের উপর। পশ্চিমোত্তর দেশের কামাউ (Kamau) বিভাগের গঢ়ওয়াল (Garhawal) জেলায় হিমালয় পর্ব্বতের অনেকগুলি শৃঙ্গ আছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি Valley ইহার এই শৃঙ্গগুলিকে পৃথক করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শৃঙ্গগুলির মধ্যে শ্রীনগরের শৃঙ্গ (Range), সকল অপেক্ষা চওড়া (বিস্তৃত) ও ১৮২০ ফীট উচ্চ। চওড়ায় প্রায় ২ মাইল। এই প্রান্তে প্রায় ৩ মাইল সমতল ভুমী আছে।

প্রথম শৃঙ্গের উচ্চতা "নন্দাদেবী"—২৫৬৬১ ফিট।
"কামেট"—২৫৪১৩ ফিট।
"ত্রিশূল"—২৩৩৮২ ফিট।
"দুনাগিরি"—২৩১৮১ ফিট।
"বদরীনাথ"—২২৯০১ ফিট।
"কেদারনাথ"—২২৮৫৩ ফিট।

ধবলী ও সরস্বতী (Valley) হইয়া চীনদেশে যাইবার রাস্তা গিয়াছে। ধবলী (Valley)কে "নীতিপাস" ও সরস্বতী (Valley)কে "নানাপাস" বলে। "অলকনন্দা" নদী গঙ্গার একটী প্রধান শাখা। অলকনন্দা ও অন্যান্য নদীর সঙ্গমের পবিত্র স্থানগুলিতে **(১) কর্ণপ্রয়াগ (২) রুদ্রপ্রয়াগ (৩) নন্দপ্রয়াগ (৪) দেবপ্রয়াগ (৫) বিষ্ণুপ্রয়াগ।** এই পাঁচটী প্রয়াগ প্রধান।

পাহাড়ী রাস্তার পরিচয়—হরিদ্বার পর্য্যন্ত রেল আছে। হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ, লছমনঝোলা হইয়া বদ্রিনাথ ও কেদার নাথে যাইবার রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ নজীবাবাদ দিয়াও যাইয়া থাকেন। হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ পর্য্যন্ত ১২ মাইল বএল গাড়ী, তাঙ্গা, মটোর, বা এক্কার রাস্তা আছে। হৃষীকেশ হইতে লছমনঝোলা (আজকাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে) হইয়া ৪০৩ মাইল কাঠগুদামের নিকটে রাণীবাগ পর্য্যন্ত হিমালয় পাহাড়ের চড়াই ওতরাই যাইতে হয়। সোয়ারীর জন্য ঝম্পান ও ডাণ্ডী এবং মালপত্র লইয়া যাইবার জন্য কুলী বা কাণ্ডি লইতে হয়। কিন্তু এই গুলির বন্দোবস্ত হরিদ্বার বা হৃষীকেশ হইতেই করিতে হয়। যাত্রীদিগের দরকারের জিনিষপত্র; কাপড়, জামা, কম্বল, তোষোক, দোলাই (রাজাই) পাজামা, জুতা, ছাতা, চরাই ওতরাইর জন্য লাঠী, পূজার জন্য মেওয়ার পুরিয়া, ছোলার ডাইল, রোগ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কেম্ফরের (Camphor) শিশি, হজমী-গুলি, জোয়ানের আরক, কুইনাইন (Quinine) ইত্যাদি লওয়া খুব দরকার। খাইবার জিনিষ সঙ্গে রাখিবার কোনও দরকার নাই। খাইবার সকল সামগ্রী সকল চটীতেই পাওয়া যায়। দোকানদারদের নিকটে সাধারণ বাসনও পাওয়া যায়। পাহাড়ীরা ক্ষেতে মলত্যাগ করিতে দেয় না। লছমনঝোলা হইতে মীলচৌরী পর্য্যন্ত গড়ওয়াল জেলা ও মিচৌরী হইতে কমাউ জেলা আরম্ভ হইয়াছে। এখানকার অধিবাসী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। ইহারা কুলীর কাজ পর্য্যন্ত করে। কারণ এক কাজে ইহাদের জীবন বহন হইতে পারে না। কেদার ও

বদ্রিনাথের পাহাড় উচ্চ বটে কিন্তু এখান হইতে হিমালয়ের আরও উচ্চ শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। রুদ্রপ্রয়াগও কেদারের মধ্যে এবং কেদার হইতে ফিরিবার বময় মত্রৌলি পর্য্যন্ত এবং গুলাব টৌলী হইতে বদ্রীনাথ পর্য্যন্ত অনেক গুলির গুহা এবং বড় বড় পাথরের রক দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন গুহায় ২।৪ জন লোক আর কোন কোন গুহায় প্রায় ১০০ জন লোক বর্ষার জল হইতে বাঁচিতে পারে।

নদী—পাহাড়ী নদীর জল পাথরের জমীর উপর অতিবেগে পতিত হয়। হরিদ্বার হইতে রাণীবাগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৪১৭ মাইল পর্য্যন্ত নদীতে কোথাও নৌকা পাওয়া যায় না। নদীর উপরে পোল আছে, কিন্তু আমাদের এ অঞ্চলের মত নহে। কেবল নদীর দুই ধারে দুইটী পাকা থাম দিয়া তার বা দড়ীর ঝোলার মত করিয়া পোল তৈয়ার করে। নদীতে এত বেগ যে অল্প জলেতেও কেহ হাটিয়া এপার ওপার করিতে পারে না। যাত্রীদিগের জন্য কাঠের বা লোহার পোল করা হইয়াছে।

জিনিস পত্র—সমস্ত চটীতে খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। এমন কি কাপড় বাসন, কাগজ, পেন্সিল, দেশলাই, সিগারেট ইত্যাদি পাওয়া যায়।

যাত্রীদের বিশেষ জ্ঞাতব্য—কেদারনাথ ও বদ্রিনাথের রাস্তা অতি সহজ হইয়া গিয়াছে। প্রতিদিন শত শত লোক ছেলে বুড়ো স্ত্রী ঝাম্পান ও কাণ্ডিতে, হাটিয়া যাওয়া আসা করে। ছয় মাসের ছেলে ঝাম্পানের উপর মায়ের কোলে বসিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। কোন প্রকার রোগ গ্রস্ত হইলে কাণ্ডি ভাড়া করিয়া উহাদিগকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাওয়া যায় মোটা লোকের জন্য ঝাম্পান বা কাণ্ডি পাওয়া যায় না। শ্রীনগর ও দেব প্রয়াগে নাপতে ও ধোপা পাওয়া যায়। সমস্ত চটী ও দোকানদারদের দোকানে একদর এক কথায় জিনিস বিক্রয় হয়। রুদ্রপ্রয়াগের আগে কেদারনাথের রাস্তায় উরবী মঠের পর বদ্রিনাথের নিকটে এক প্রকারের বিষাক্ত মাছি আছে, উহা কামড়াইবার সময় কিছু জানিতে পারা যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ঘা হইয়া চুলকাইতে থাকে এবং বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। কর্ণপ্রয়াগ ও মিরচৌলির মধ্যস্থ জল হাওয়া অত্যন্ত খারাপ। এ দেশের ঝরণার জল অত্যন্ত মিষ্টি ও স্বাস্থ্যকর। যাত্রীরা সকাল বিকালে রাস্তা চলে, দুপুর বেলা বিশ্রাম করে। হরিদ্বার হইতে রওনা হইয়া ৪১৭ মাইল কাঠগুদাম রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌছিতে দেড় মাস লাগে। কেদার ও বদ্রিনাথের পাহাড়ের উপর বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বর্ষা জমিয়া থাকে। এই সময়ে যাত্রীদিগের দুইটী অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। প্রথমতঃ পাহাড়ের চড়াই ও ওতরাই অতিক্রম করা, দ্বিতীয়তঃ স্থানের (জায়গার) সংকীর্ণতা। কিন্তু এই অসুবিধা দুর করা সাধ্যাতীত।

মূল্য—হৃষীকেশে আটা ৵১০ আনা সের,
বদ্রীনাথে „ ।০ আনা সের
কেদারনাথে „ ।০ আনা সের বিক্রয় হয়।

রাস্তায় বিশ্রামের জন্য চটী এবং চটীর নাম ও এক চটী হইতে অন্য চটী কত দূর, মাইল হিসাবে সমস্ত লেখা হইল :—

হরিদ্বার হইতে ৭ মাইল সত্যনারায়ণ। হৃষিকেশ (১৷০ মণের রীতী) ১॥ মাইল লছমণঝোলা (চরাই ওতরাই)

২ গরুড়া
২ ফুলওয়ারী
২ গুলির (উমেরী)
৩ মোহত।
১॥ ছোট বিজনী
১॥ বড় বিজনী
৬ কুণ্ড
৩ বান্দার (উতরাই) নাবা
৩ মহাদেব
৪ শিমলা
২॥ কাণ্ডি (হস্বতাল)
৪॥ ব্যাসঘাট (চড়াই নাবাই)
৩ তুলারী।
২ উলারী। (উমের)
২॥ মীলসাউর (ভাউরী)
৩ মাইল গুলিবরায়।
২ ,, রুদ্রপ্রয়াগ (এখান হইতে বদ্রিকাশ্রম যাওয়া যায়)।
৫ মাইল ছতালী।
২॥ „ রামপুরা।
৩॥ „ অগস্তমুনি।
২ „ সাউরী
২ ,, চন্দ্রাপুরী
২ „ ভীমসেন।
১ „ ভীরী।
৪ „ কুণ্ড (চড়াই)।
৩ „ গুপ্তকাশী।

২ মাইল নালা। (বদ্রীনাথে যাইবার পথ)
২॥ „ দেবপ্রয়াগ (ডাক ও তারঘর) গঙ্গোত্রী ওযমুনেত্রী যাইবার পথ। এই স্থান দিয়া যাইতে হয়।
৮ মাইল রাণীবাগ
৭ „ রামপুর (এখানে জল পাওয়া যায় না)
৫ „ বিল্বকেদার
৩ „ শ্রীনগর (হাস্পাতাল, ডাক ও তারঘর)
৪ „ সুকারতী।
৪ „ ভাটীসেরা।
৩ ,, খাঁগরা
৪ ,, নারকোটী। (চড়াই নামাই)
৩ ,, ভেতা (নারায়ণ)
২ ,, নীউ
২ „ তুর্গা (এখানে একটী বড় ঝুলা আছে)
২॥ ,, ফাটা
৩ „ বাদলা
৩ „ রামপুর (পতিগাধা নামক নিকট হইতে ত্রিযুগী নারায়ণ যাইবার রাস্তা।
৩ „ ঝলমল (সোন প্রয়াগ)
৩ ,, গৌরীকুণ্ড। (এইস্থানে উচ্চ চড়াই)
২ „ জঙ্গল (আরাম)
২ „ রামবাড়া।

৪ মাইল হিমালয় পর্ব্বতের এক তুষারাচ্ছন্ন শিখরে শ্রীকেদারনাথ জিউর সুন্দর মন্দির বিরাজমান। এই প্রধান মন্দির ২৫৮৫৩ ফিট উচ্চ। এই মন্দিরের নিকট আর

চারিটী মন্দির আছে, এই গুলিকে পঞ্চকেদার বলে। এই স্থানে একটী উচ্চ পাথরের রক আছে, ইহা ভৈরব ঝম্প নামে বিখ্যাত। শ্রীকেদার নাথের দর্শনের পর বদ্রীনাথ জিউর দর্শন করা বিধেয়। "নালা" ফিরিয়া আসিয়া নিম্নলিখিত পথে চলিতে হয়।

৩ মাইল উখ্‌খীমঠ (হাসপাতাল ও ডাক ঘর)
৩ গণেশ (চড়াই)
২ দুর্গা।
২ শোধ।
১ চৌবনা (এই স্থান হইতে তুঙ্গনাথ যাইবার পথ এই স্থানেই শিবের বিবাহ হইয়াছিল, ইহাও দেখিবার উপযুক্ত।
২ ,, ভীভনাড়া।
২ ,, ভীমযোড়া
২॥ ,, বঙ্গড় বাসা।
৩॥ ,, মণ্ডল (নামা)
৪॥ ,, পতী।
২ ,, গকুল।
২ ,, গোপেশ্বর।
২ ,, মঠ।
৩ ,, হিলাল।
২ ,, সিয়া।
২ ,, গোলাপ কুঠি।
১ ,, কঙ্কনী।
১ ,, নোশী মঠ।
৪ ,, ঘাট।
২ ,, পাণ্ডকেশ্বর।
৩ ,, হনুমান চড়াই শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রম।

॥ মাইল পুন্নন।
৭ হাট।
২ পিপল কোঠী (চড়াই)
৪ মাইল গরুড় গঙ্গা।
২ ,, টাঙ্গরী।
২ ,, আরাম (এখান হইতে ইন্দ্রনাথে যাইবার রাস্তা)।
১ ,, রাম।
১ ,, সিটানা (বাজেশ)।
২ ,, লালসাঙ্গা (চমোলী) এখানে ডাক ঘর ও হাসপাতাল আছে।
২ ,, ছিকা।
২ ,, পাতাল গঙ্গা।
২ ,, বনোটী (পেণৌ বা ধ্যানী বদ্রী)।
২ ,, সিংহধার।
১॥ ,, বিষ্ণুপ্রয়াগ (উতরাই)
১ ,, নন্দকেশ্বর।
৩ ,, রাম বগাড।

শ্রীশ্রীবদরিকাশ্রম বদ্রিনাথ জিউয়ের মূর্ত্তি চতুর্ভুজ কালো পাথরের মূর্ত্তি। বিষ্ণু মূর্ত্তির সূচনা। শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য জিউ স্বপ্নে পাইয়াছিলেন। এবং তিনিই এই মন্দিরে এই মূর্ত্তির স্থাপনা করিয়াছিলেন। মন্দিরের ভিতর লক্ষ্মী-নারায়ণ, উদ্ধব, নারদ, কুবের, গণেশ, ইত্যাদি অনেক দেব মূর্ত্তি আছে। লক্ষ্মীর মন্দির, গৌরীকুণ্ড, তপ্তকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, কর্ম্মধারা, ব্রহ্ম কপালী। (এখানে পিণ্ডদান করিবার বিধান আছে। মহন্তের গদী দেখিবার উপযুক্ত।

যাত্রিদের সুবিধার জন্য কালীকমলীওয়ালার ধর্ম্মশালা আছে। এতৎভিন্ন আরও অন্যান্য ধর্ম্মশালা আছে। শ্রীবদ্রিনারায়ণের মন্দির ছয় মাস খোলা এবং ছয় মাস বন্ধ থাকে। বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন খোলা হয়। এবং ঠিক দেয়ালীর দিন বন্ধ হইয়া যায়।

হরিদ্বার হইতে কেদার ১৪৮ মাইল, কেদার হইতে নাঙ্গা ২৬ মাইল। নাঙ্গা হইতে বদ্রিনারায়ণ ৭৯ মাইল, বদ্রী হইতে সঙ্গা ৪৫ মাইল, লালসঙ্গা হইতে ঠামনগর রেলওয়ে-ষ্টেশন প্রায় ১১৮ মাইল। রামসঙ্গা হইতে রামনগরের পথে নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ শ্রাদ্ধ বদ্রীমেহার, চৌরামাসী বুড়া কেদার ইত্যাদি অনেক চটী আছে। কেদার বদ্রিনারায়ণের পরিক্রমা ৪১৭ মাইল।

পঞ্চতীর্থ—বদ্রিকাশ্রমে ঋষিগঙ্গা, কূর্ম্মধারা, প্রহ্লাদ ধারা, তপ্তকুণ্ড ও নারদকুণ্ড এই পাঁচটীর নাম পঞ্চতীর্থ।

পঞ্চ শিলা—বদ্রিকাশ্রমে নারদ শিলা, বরাহ শিলা, মার্কণ্ডেয় শিলা, নৃসিংহ শিলা গরুড় শিলা, এই পাঁচটী প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্মকপালী—বদ্রীনাথের মন্দিরের নিকটে প্রায় ৫০০ শত গজ উত্তরে অলকনন্দার কিনারায় ব্রহ্মকপালী শিলা আছে। ইহার উপর বসিয়া যাত্রীগণ পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদান করে। সেখান হইতে (ভাত) প্রসাদের ২১৬ ছোট ছোট গুলি তৈয়ার করা হয়। ইহা যাত্রী নিজেদের মৃত পিতৃপুরুষ ও তাঁহাদের স্ত্রীদিগকে দান করে। আর শেষ চারিটী গুলি নিজের মিত্র, গুরু, ও নিজ কুলের মৃত লোকের নাম লইয়া ভূমির উপর নিক্ষেপ করে। তাহার পর সেই পিণ্ড গুলি লইয়া অলকনন্দায় ফেলিয়া নদীতে অঞ্জলি অঞ্জলি জল দান করে। যাহারা ব্রহ্মকপালীতে কাজ করায় বা দক্ষিণা লয় তাহারা সেখানকার পাণ্ডা নহে। এই সকল কার্য্যের জন্য অন্য ব্রাহ্মণ আছে।

অলকনন্দা নদী—এই নদী উত্তর দিক হইতে সৎপথ অলোকাপুর পাহাড় দিয়া বদ্রিকাশ্রমে আসিয়া ১৩১।৪ মাইলে দেবপ্রয়াগের নিকটে গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। ইহার ধারে পাণ্ডুকেশ্বর, জোশীমঠ, বিষ্ণু প্রয়াগ, কুম্ভার চটী, পীপলকোঠী চটী, চমোলী নন্দপ্রয়াগ, কর্ণ প্রয়াগ, রুদ্র প্রয়াগ, শ্রীনগর ও দেব প্রয়াগ, এই সকল প্রসিদ্ধ স্থান আছে।

বসুধারা—বদ্রিনাথ হইতে ১১।২ মাইল উত্তরে মানগ্রাম বস্তি ও ২১।৪ মাইলের পর বসুধারা তীর্থ আছে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে বরফ কম হইলে লোকে এই স্থানে স্নান করে। পূর্ব্বকালে অষ্ট বসুরা এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। মানস সরোবরের যাত্রীরা এই রাস্তায় আসা যাওয়া করিয়া থাকে।

ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট (Government) ও টিহরী রাজার আজ্ঞায় দক্ষিণী নাগরী ব্রাহ্মণ বদ্রিনাথের পূজারী নিযুক্ত হইয়া থাকে। যাহাদের লোকে রায়ল বলে। রায়লেরা বিবাহ করে না। টিহরী, জোশি মঠ ও পাণ্ডুকেশ্বর বস্তীর কোন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীয় নিজের কন্যা

বদ্রিনাথের পূজায় অর্পণ করে। সেখানকার প্রচলিত প্রথা অনুসারে সেই কন্যাগণ রায়লের স্ত্রী হইয়া থাকে। রায়ল নিজের স্ত্রীর পাকান্ন ভোজন করে না। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের সন্তান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হয়। রায়লের মৃত্যুর পরে রায়লের পুত্র রায়ল হয় না। নূতন রায়ল দক্ষিণ দেশ হইতে আনায়ণ করা হয়।

পদ্মপুরাণ—স্বর্গ খণ্ডের ২২ অধ্যায়ে লেখা আছে যে কেহ, নারী ক্রয় করিয়া দেবতাকে অর্পণ করিবে সে কল্প পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করিবে। তাহার পর রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে ও পৃথিবীতে রাজ্য করিবে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৭ অধ্যায়ে লেখা আছে যে ব্রাহ্মণের ধন ১০ ভাগে বিভক্ত হইবে। যথা :—

(১) ব্রাহ্মণের পুত্র নিজ পিতৃধনের ৪ ভাগ পাইবে।

(২) ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ পুত্র ৩ ভাগ পাইবে।

(৩) বৈশ্য স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ পুত্র ২ ভাগ পাইবে।

(৪) শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ পুত্র ১ ভাগ পাইবে।

শ্রীবদ্রিনাথের বাৎসরিক আয় ৩০ হইতে ৪০ হাজার টাকা।

সুফল—এখানকার সমস্ত পাণ্ডা দেবপ্রয়াগের লোক। সুফল করাইবার সময় তাহারা নিজের যাত্রীর হাতে মালা বাধিয়া দেয়। এইরূপ কয়েদী বাধনযুক্ত যাত্রী, পাণ্ডাদিগের মনমত দক্ষিণা না দিলে শীঘ্র সুফল পায় না। যাত্রীরা বাধনযুক্ত হাতে ছটফট করিতে থাকে। কেদারের পাণ্ডাদিগেরও এই নিয়ম।

এলাহাবাদ।

এলাহাবাদ ই, আই, রেলের (E. I. Ry.) প্রধান জংসন ষ্টেশন। ইহা য়ুনাইটেড্ প্রেসিডেন্সি, আগরা ও আউধের (United presidency of Ogra & Audh) (পশ্চিমোত্তর দেশ) রাজধানী গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমের উপর প্রসিদ্ধ সহর। এবং ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন তীর্থ, "প্রয়াগ" নামে বিখ্যাত। ষ্টেশন হইতে ত্রিবেণী ঘাট চার মাইল দূরে। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমকে ত্রিবেণী তীর্থ বলে। যমুনার কাল জল ধারা গঙ্গার জলে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এলাহাবাদের কেল্লা ও সহর আকবর সম্রাটের তৈয়ারী। আকবর পুত্র জাহাঙ্গীর শাহ এই কেল্লাতেই থাকিতেন।

এলাহাবাদের "খুশরোবাগ" সম্রাটের প্রতারিত পুত্র খুশরোর কবরটীকে বুকে লইয়া শাহাজাদার স্মৃতি জাগরিত রাখিয়াছে।

খুশরোবাগ অতি সুন্দর ও মনোরম স্থান। ইহার ভিতর তিনটী সমাধি আছে। প্রথম সমাধিটী শাহাজাদা খুশরোর, দ্বিতীয়টী তাহার ভগ্নি শাহাজাদির, তৃতীয়টী তাহার মাতা বেগমের। এই বেগম রাজপুত রমণী ছিলেন। খুশরোর সমাধি

অতি সুন্দর। ইহা পূর্ব্বে আরও সুন্দর ছিল। এখন উহার রং খারাপ হইয়া গিয়াছে। আকবরের তৈয়ারী কেল্লা নদীর উপর হইতে অতি সুন্দর দেখায়। ভিতরে গিয়া দেখিলে থামের ৮টী শ্রেণীর উপর একটী চার কোণা কামরা দেখিতে পাওয়া যায়। উহা দেখিতে অতি মনোরম।

এই স্থানে সম্রাট অশোকের নির্ম্মিত ৩৫ ফিট উচ্চ একটী স্তম্ভ আছে, যাহার উপর অশোকের অনুশাসন খোদিত আছে। সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের বিজয় বার্ত্তাও এই স্তম্ভের উপর খোদিত আছে। সঙ্গমের নিকটে গঙ্গার জল শ্বেত, যমুনার জল নীল পৃথক পৃথক দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গম কখনও কেল্লার নিকটে থাকে, কখনও বা কেল্লা হইতে এক মাইল দূরে চলিয়া যায়। সঙ্গমের নিকটে পাণ্ডারা নিজ নিজ চৌকী, এবং তাহাদের চিহ্নস্বরূপে তাহাদের নিশান লাগাইয়া রাখে। দূর হইতে শত শত নিশান দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক লোক মাঘমাসে ত্রিবেণীর ধারে এক মাস কল্পবাস করে। প্রয়াগে মুণ্ডনের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। সেই জন্য সকল যাত্রিরা ত্রিবেণীতে মুণ্ডন করায় যে স্ত্রী মুণ্ডন করায় না সে নিজের মাথার এক গুচ্ছী চুল কাটিয়া দেয়। মুণ্ডনের জন্য "নৌ আ বাড়া" একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। ইহার ভিতর মুণ্ডন করাইলে প্রতি মাথা পিছু ৵৹ এক আনা করিয়া দিতে হয়। কিন্তু।৹ চারি আনার টিকিট ক্রয় করিলে যেখানে ইচ্ছা সেখানে মুণ্ডন করাতে পারে। নাপিতদের মুণ্ডন করিবার জন্য লাইসেন্স দিতে হয়। জমা করা চুলের দাম পাওয়া যায়।

প্রয়াগের মেলা—সম্পূর্ণ মাঘমাসই ত্রিবেণী যাত্রীতে পূর্ণ থাকে। কিন্তু অমাবস্যাই স্নানের প্রধান দিন। প্রতিবৎসর মেলায় প্রায় ২৫০০০০ লোক সমবেত হয়। ১২ বৎসরের পর যখন বৃহস্পতি বৃষরাশি গমন করেন তখন কুম্ভের বড় মেলা হইয়া থাকে।

দেবাসুর সংগ্রামে দেবগুরু বৃহস্পতি অমৃত লইয়া পলাতক হন। ভাগীরথি, ত্রিবেণী, গোদাবরী এবং ক্ষিপ্রার ধারে বৃহস্পতির সহিত দানবদের যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সময় অমৃত কুণ্ড হইতে অমৃত ভূমিতে পতিত হইয়াছিল। তাহাই কুম্ভের বৃহস্পতি হইলে প্রয়াগে, সিংহের বৃহস্পতি হইলে নাসিকে, এবং বৃশ্চিকে বৃহস্পতি হইলে উজ্জয়িনীতে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত দেবতাদিগের স্থান পরিক্রমা করিতে হয়।

(১) অলোপীদেবী।

(২) বেণীমাধব।

(৩) লিঙ্গস্বরূপ বাসুকীজিউ গঙ্গার ধারে, (নাগপঞ্চমীর মেলা এইখানে হইয়া থাকে।

(৪) লিঙ্গস্বরূপ ভরদ্বাজ ও যাজ্ঞবল্ক মুনির ছোট মূর্ত্তি, সহরের একপার্শ্বে একটী মন্দিরের ভিতর আছে।

(৫) সোমনাথ (যমুনার পরপারে একটী মন্দির আছে)।

(৬) দারাগঞ্জের নিকট গঙ্গায় দশাশ্বমেধ তীর্থ আছে। এইখানে ব্রহ্মেশ্বর ও শূলটঙ্কেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন।

অক্ষয়বট—যাত্রীরা পূর্ব্ব ফটক দিয়া কেল্লার ভিতর প্রবেশ করে। ইহার দক্ষিণ দিকে অক্ষয় বট আছে। পাণ্ডারা আলো জ্বালিয়া ভিতরে লইয়া যায়। অনেকগুলি সিড়ী নামিলে পর অধিকার পথ পাওয়া যায়। ৬৩ ফিট পূর্ব্ব দক্ষিণ জমির ভিতরে তুইটী শাখা যুক্ত, তুইটী পাতাযুক্ত অক্ষয় বট আছে। পথে কতকগুলি দেব মূর্ত্তি এবং অক্ষয় বটের নিকটে একটী শিবলিঙ্গ আছে। যাত্রীরা অক্ষয় বটের পূজা পরিক্রমা ও অঙ্গমালা করিয়া থাকে।

বিন্ধ্যাচল

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের মেন লাইনে মোগলসরাই ষ্টেশন হইতে পশ্চিমাভিমুখে যাইতে হইলে মোগলসরাইয়ের পর মির্জাপুর বড় ষ্টেশন, তাহার একটু এদিকে বিন্ধ্যাচল ষ্টেশন। গঙ্গার কিনারায় বিন্ধ্যগিরির একাংশে পাহাড়ের উপর বিন্দুবাসিনী দেবীর প্রাচীন মন্দির। ইহা হইতে পৃথক স্থানে নূতন মন্দির তৈয়ার করা হইয়াছে। ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে মির্জাপুর জেলায় গঙ্গার ডান দিকে বিন্ধ্যাচল একটী বড় বস্তি। এই বস্তিতে পাণ্ডাদিগের বাড়ীই বেশি। বাজারে যাত্রীদিগের সকল রকম প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায়।

ধর্ম্মশালা—ষ্টেশনের পূর্ব্ব দিকে একটী পাকা ধর্ম্মশালা আছে। পশ্চিমদিকে বরহনের বাবু সাহেবের তৈয়ারী আর একটী ধর্ম্মশালা আছে। ইহাতে অনেক যাত্রী থাকে। ভগবতী, এখানকার প্রধানা দেবী। ইহার নাম পুরাণে কৌশিকী ও কাত্যায়িনী লেখা আছে, ইহার মন্দির বিন্ধ্যাচল বস্তির ভিতর পশ্চিমাভিমুখী। মন্দিরের দক্ষিণ ভাগ কাঠ ও জঙ্গলে ঘেরা, এখানে সিংহের উপর দাঁড়ান আড়াই হাত উচ্চ ভগবতীর শ্যাম মূর্ত্তি বিদ্যমান। ভগবতীর নিজ মন্দিরে সাতটী ঘণ্টা আছে। পশ্চিমে দালানের পর বলিদানের প্রাঙ্গণ। ইহার পশ্চিমদিকে একটী মন্দিরের ভিতর দ্বাদশভুজা এবং আর একটীতে খোপড়েশ্বর মহাদেব, দক্ষিণদিকে একটী মন্দিরের ভিতর মহাকালী ও উত্তর ধর্ম্মধ্বজা আছে। ভগবতীর মন্দিরে দক্ষিণদিক খোলা একটী মণ্ডপ আছে। মন্দিরের উত্তরে বিন্ধ্যেশ্বর মহাদেবের মন্দির। ইহার নিকটে হনুমানের মূর্ত্তির কাছে পাণ্ডারা যাত্রীদের যাত্রা সুফল করাইয়া দেয়।

বিন্ধ্যাচল হইতে উত্তরে গঙ্গার চড়ায় একটী ছোট রোয়াকের উপর একটী শিবলিঙ্গ আছে। সেই রোয়াকে একটী লিপি আছে। সেই লিপিটীর কেবল মাত্র এই কয়একটী কথা পড়া যায় "কাশী নরেশ, সংবত ১৭৩৩ বৈশাখ কৃষ্ণপঞ্চমী", এতদ্ভিন্ন আরও একটী লিপি ইহার নিকটে আছে। ভগবতী, কালী ও অষ্টভুজা এই তিনটী মূর্ত্তিকে ত্রিকোণ যাত্রা কহে। ভগবতী পার্ব্বতীর শরীর হইতে আবির্ভূতা, আদি পুরাণে ইহারই নাম কৌশিকী

কাত্যায়নী, চণ্ডিকা, ইত্যাদি লেখা আছে। যখন চণ্ড ও মুণ্ডের সহিত কালী ও কৌশিকার যুদ্ধ হয়, তখন কৌশিকার ললাট হইতে যে দেবী আবির্ভূত হন তাঁহারই নাম চামুণ্ডা হইল, অষ্টভুজা গোকুলে নন্দের গৃহে জন্মাইলেন, ইঁহাকে কংশ আছাড় মারিতে উদ্যত হইলে তিনি কংশের মস্তকে পদার্পণ করিয়া আকাশে চলিয়া গিয়াছিলেন।

বিন্ধ্যাচল হইতে ২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে পাহাড়ের গোড়ায় কালীদাহ নামক স্থানে কালীর একটী মন্দির আছে। কালীর একটুখানি শরীরের উপর তাহার অতি বড় মুখ লাগান আছে। এখানে কালীর নামে অনেকে মুর্গী ছাড়িয়া দেয়। পাহাড়ের উপর উঠিবার জন্য ১০৮টী সিঁড়ী আছে। কালীখোহ হইতে পশ্চিমোত্তরে দুই মাইল চলিবার পর জঙ্গলে আবৃত একটী ছোট পাহাড়ের পাশে অষ্টভুজা দেবীর মন্দির আছে। বিন্ধ্যাচল ও অষ্টভুজার মধ্যে রামেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দির আছে। যাহার দ্বারায় উত্তর গঙ্গার তীরে রামগয়ায় পিণ্ড দান করা হয়। বিন্ধ্যাচল স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের একটী সুন্দর স্থান।

নেপাল।

নেপালে পশুপতি নাথের দর্শন হয়। নেপালে যাইবার জন্য নেপালের সরকারী পাশের ব্যাবস্থা করা উচিত, কারণ তাহাদের পাস না হইলে আটক করে। অর্থাৎ যাইতে দেয় না। কিন্তু শিবচতুর্দ্দশীর দিনে পশুপতি নাথের দরজা খোলা থাকে। সে সময় পাসের দরকার হয় না। নেপাল যাইতে হইলে বী, এন, ডব্লিউ (B. N. W. Ry.) রেল দিয়া রকসৌল পৌছিয়া নেপাল রাজ্যের রাজধানী কাঠমুণ্ডাম (ইহা ষ্টেশন হইতে ৬২ মাইল দূরে) হইয়া যাইতে হয়। পায়ে হাটা পথেই যাইতে হয়। রকসৌল হইতে দুই মাইল দূরে "বীরগঞ্জ" প্রথম চটীতে খাবার দাবার রসদ, ইত্যাদি পাওয়া যায়। পথে বিচাকোড়ী, চুড়িয়া ভীমদেবী, চীশা পানীগোড়ী, কুলীখালী, চেতমোল, চন্দ্রগিরি, থানকোট ইত্যাদি চটী পাওয়া যায়। রাজধানী কাটমাণ্ড ৪৫০০ ফিট উচ্চ একটী পাহাড়ের উপর। এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে।

দেখিবার উপযুক্ত স্থান—পশুপতিনাথ, বাগমতী নদী, পূজেশ্বরী দেবী, হনুমান ঢোকা, ইন্দ্রচকবাজার, টুলীখিলী ময়দান, কায়াখোলীর দর্ব্বার, মহেন্দ্র নাথের মন্দির, লালদর্ব্বার, বাগদর্ব্বার, রাণীতালাব, বৌদ্ধমন্দির, ভালীকুজা, মনুমেণ্ট, ইত্যাদি দেখিবার উপযুক্ত।

ভালীকুজা মন্দির—ইহা একটী প্রশস্ত মন্দির, কেবল রাজদর্ব্বারের লোক এখানে পূজা করেন।

মুছন্দর নাথের মন্দির—বাগমতী নদীর কাছে মুছন্দর নাথের সুন্দর মন্দির আছে। মুছন্দরনাথ নেপালের প্রধান দেবতা। সেখানকার লোকে এই ঠাকুরকে নেপালের রক্ষক বলিয়া গণ্য করে।

মেষের সংক্রান্তির দিন অতি সমারোহের সহিত মুছন্দরনাথের রথ বাহির হয়।

পশুপতিনাথের মন্দির—মহারাজের রাজপ্রাসাদের এক ক্রোশ উত্তরে একটী চণ্ডগামার ভিতরে পশুপতিনাথের মন্দির অবস্থিত। ইহার চারিদিকেই দালান। মন্দিরের মধ্যে তিন হাত উচ্চ পাথরের তৈয়ারী পঞ্চমুখী পশুপতিনাথের মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তির চারিধারে লোহার গরাদ দেওয়া আছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে বিন্দুমতী নদী প্রবাহিতা, ইহাতে যাত্রীরা স্নান করিয়া থাকেন। যাহারা গঙ্গাজল লইয়া যায় তাহারা পাণ্ডাব দ্বারায় পশুপতিনাথের মাথায় ঢালিয়া দেয়। মন্দিরের নিকটেই পাকা দোতলা অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে, ইহাতে যাত্রীরা থাকিতে পায়।

চিত্রকূট।

মণিপুর ই, আই, ও জি, আই, পি, রেলের একটী জংসন ষ্টেশন। এখানে জি, আই, পি, ঝাঁন্সী হইয়া আসে। ষ্টেশন হইতে তীর্থ প্রায় তিন মাইল দূরে। যাত্রীর সুবিধার জন্য ধর্ম্মশালা আছে। ইহা অত্যন্ত রমনীয় স্থান। এখানে অধিকাংশই সাধুদের বাস। এই স্থানটীর প্রাচীনত্ব ও সুখ্যাতি রামায়ণের সময় হইতেই ঋষিদের আশ্রম ও সুন্দর স্থান বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। শ্রীরামচন্দ্র বনবাসের সময় অনেক দিন পর্য্যন্ত এখানে বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানের নাম লইলেই পুরুষোত্তম রামের কথা মনে পড়ে। চিত্রকূটের আয়তন পাঁচ ক্রোস বলিয়া খ্যাত। যাত্রীরাও চিত্রকুট পর্ব্বতের চারি দিকে পাঁচক্রোশ ঘুরিয়া তীর্থ করিয়া থাকেন। চিত্রকূটের পঞ্চক্রোশীর ভিতর অনেক জিনিষ দেখিবার আছে। পান্নার রাজা রামচন্দ্র চিত্রকুট পর্ব্বতের নীচে চারিধারে পাকা রোয়াক করিয়া দিয়াছেন,ইহার দ্বারায় যাত্রীরা অতি আনন্দের সহিত অনায়াসে পর্ব্বতের পরিক্রমা করিতে পারে। পাহাড়ের চারিধারে পৈশুনি নদীর ধারে ৩৩টী দেববেবীর মন্দির আছে। চরণ-পাদুকা বলিয়া একটী মন্দিরের ভিতর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, জানকী ও লক্ষ্মণের পদ চিহ্নের দর্শন হয়। চৈত্রমাসের রামনবমী এবং কার্ত্তিক মাসের দিপাবলীর দিন বড় মেলা হয়। অমাবস্যা ও গ্রহণে ছোট মেলা হয়। কোটিতীর্থ, দেবাঙ্গনা, হনুমানধারা, স্ফটিকশিলা, অনুসুয়া, গুপ্তগোদাবরী ও ভরত কূপ এই সাতটী প্রধান। ইহার অতিরিক্ত আরও স্থান আছে। কামতানাথের মন্দির, সীতার রান্নাবাড়ী, প্রমোদবন, জানকীকুণ্ড, স্ফটিকশিলা,

সিদ্ধবাবার স্থান, কৈলাস, গুপ্ত গোদাবরী, রামশৈয্যা, সকুনী মহাত্মা, তুলসীদাসের স্থান দর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা পায়ে হাঁটিয়া দেখিতে পারে না, তাহাদিগের জন্য পাল্কী বা ঘোড়া পাওয়া যায়। পাণ্ডারা যাত্রীদের থাকিবার স্থান দেয়। রামঘাটে স্নান, তর্পণ ও পিণ্ডদান করিবার নিয়ম আছে।

অমৃতসহর।

অমৃতসহর পাঞ্জাবের একটী প্রধান ও বিখ্যাত সহর এন, ডব্লিউ, রেলওয়ে (N. W. Ry) লাইনে আছে। এখানে দর্ব্বার সাহেব (স্বর্ণমন্দির) অতি বিখ্যাত এবং যাহার খ্যাতি ভারতবর্ষেই কেন অন্যান্য দেশেও আছে। এই মন্দিরটী একটী বড় পুকুরের মধ্যে তৈয়ারী। ইহার ছাদ সোনা দিয়া মোড়া। পুকুরের চারিধারে শ্বেত পাথরের রোয়াক দিয়া ঘেরা। এই দালান বা চৌতরা বা রোয়াকের উপর দিয়া মন্দিরের ভিতর যাইবার জন্য পোল আছে; এই পোলটীও শ্বেতপাথরের তৈরী। পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে দুটী ছোট ছোট মনুমেণ্টের মতন আছে, ইহা দেখিবার উপযুক্ত। এই মনুমেণ্ট হইতে শহরের শোভা দেখিতে অতি সুন্দর। এই মন্দিরটী সিক্ সম্প্রদায়ের। সেই কারণেই অমৃতসহর শিখদের পবিত্র স্থান। দিপাবলীর দিন এখানে খুব বড় মেলা হয়। এখানে হাল বাজার, ক্লক টাওয়ার (Clock Tower) টাউন হল, (Town Hall) সন্তক পুকুর দেখিবার উপযুক্ত স্থান। জালিয়ানওয়ালা বাগান কখনই ভোলা উচিত নহে। প্রত্যেক ভারত সন্তানমাত্রেই যাঁহারা অমৃতসহর দেখিতে যাইবেন ইহা স্মরণ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। এবং পবিত্র স্থানের দর্শন করাও খুব দরকার। ষ্টেশনের সন্নিকটেই লালা সন্তরামের ধর্ম্মশালা আছে। ইহার অতিরিক্ত আর অনেকগুলি ধর্ম্মশালা ও সরাই আছে।

চিতোর।

চিতোর রাজপুতনায় মেবার প্রদেশের উদয়পুর রাজ্যে পাহাড়ী কেল্লার নীচে চারিদিক দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটী বস্তি। যখন চিতোরে মেবারের রাজধানী ছিল, সে সময় সহর কেল্লার ভিতর ছিল। নীচে কেবল বাহিরের বাজার ছিল।

কেল্লা দেখিবার জন্য উদয়পুরের মহারাজের কর্ম্মচারীর নিকট হইতে চিতোরের জন্য পাস লইতে হয়। চিতোরের বিখ্যাত কেল্লা এখন ধ্বংশ হইতে বসিয়াছে। প্রবাদ আছে

যে সন ৭২৮ খৃষ্টাব্দে বাপ্পা রায়ল, কাহারও নিকট হইতে কেল্লা কাড়িয়া লইয়াছিল, সেই অবধি সন ১৫৬৮ পর্য্যন্ত ইহা মেবারের রাজধানী ছিল। গম্ভীরী নদীর পাথরের পোলের উপর দিয়া এই কেল্লায় যাইতে হয়।

যে পাহাড়েরর উপর কেল্লা আছে তাহা আস পাসের দেশ হইতে অনুমান ৪৫০ ফিট উচ্চ আর ৩॥ মাইল লম্বা। যাহার শিখর অনেকগুলি ভাঙ্গাচোরা মহল ও মন্দির দ্বারায় ভরা। কেল্লার দক্ষিণ ভাগে ৫টী বড় পুকুর আছে এবং শেষ ভাগে চিতোরিস নামক গোলাকার একটী ছোট পাহাড় আছে। কেল্লার ভিতর ছোট বড় ৩২টী সরোবর আছে। কেল্লার শেষ ভাগ পর্য্যন্ত এক মাইল লম্বা পাথরের রাস্তা আছে। ইহার স্থানে স্থানে পদলপোল, ভৈরব পোল, হনুমান পোল, গণেশ পোল, জোরলা পোল। লক্ষ্মণ পোল, ও রাম পোল নামক ৭টী ফটক আছে, ইহার নিকটে চিতোরের মৃত বীরের স্মারক চিহ্নের নিমিত্ত কতকগুলি ছাতা তৈয়ারী আছে। পুরাতন সহরের সব জায়গা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দেখিবার জিনিসের মধ্যে কীর্ত্তিক ও জয়স্তম্ভ নামক দুইটী চূড়া আছে। কেল্লার ক্ষেত্র ফল ৬৯৩ একড়। যাহা এক দেয়াল হইতে অন্য দেয়াল পর্য্যন্ত লম্বা ৫৭৩৫ গজ অর্থাৎ ৩॥ মাইল এবং চওড়া ৮৩৬ গজ। কেল্লার দেয়াল, লম্বায় ১২১১৩ গজ অর্থাৎ ৭ মাইল চেয়ে কিছু কম। পূর্ব্ব সহর-রক্ষার নিকট একটী চার কোণা স্তম্ভ আছে তাহার উচ্চতা ৭৫ ফিট, এবং উহার নীচেকার ভাগ ৩০ ফিট, ও মাথার নিকট ১৫ ফিট। ইহা থলীরাণী নামক একটী স্ত্রীলোকের তৈয়ারী। এই স্তম্ভ দ্বিতীয় শতাব্দীর তৈয়ারী বলিয়া বোধ হয়। এখানে অনেকগুলি জৈন লিপি আছে। ইহার দক্ষিণে একটী মন্দির আছে। কীর্ত্তিনা হইতে কিছু দূরে শ্বেত পাথরের তৈয়ারী ১২২ ফিট উচ্চ একটী জয়স্তম্ভ আছে। প্রবাদ আছে যে ইহা সুপ্রসিদ্ধ চিতোরের রাণা কুম্ভ সন ১৪৪২ হইতে ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তৈয়ার করিয়াছিলেন। রাণা নিজের বিজয় কীর্ত্তির স্মরণার্থে এই স্তম্ভ তৈয়ার করাইয়াছিলেন। গণ্য ফটকের নিকটে ৩টী বড় বড় পুকুর আছে, এই স্থানে রাণা কুম্ভের মহল (রাজবাটী) এখানে রাণা রতন সিংহের রাজবাটি, ১৩ শতাব্দীর হিন্দু কারিগরদের উত্তম উদাহরণ স্থল। তাহার পত্নী মহারাণী পদ্মিনীর মহল পুকুরের দিকে শির উচ্চ করিয়া দণ্ডায়মান আছে। সম্রাট আকবর এই সকল রাজ বাটীর মধ্যে একটীর ফটক খুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, যাহা এখন আগরার কেল্লায় মজুত আছে। গয়াক্ষেত্রে কুম্ভের তৈয়ারী একটী উচ্চ দেবী মন্দির আছে, যাহার নিকটে তাহার পত্নীর নির্ম্মিত রণছোর (কৃষ্ণ) জিউর মন্দির আছে। চিতোরে একটী উচ্চ স্থান আছে যেথান হইতে সহরেয় সকল দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত স্থানে গোমুখী ঝরণা আছে, রাণা মুকুলসিংহের তৈয়ারী একটী পাথরের চিত্রাঙ্কিত মন্দির আছে। রাণা কুম্ভের বিবাহ মাড়ওয়াড়ে ভৈরতাগ্রামের বাসিন্দে একটী রাঠোর সর্দ্দারের কন্যা মীরাবাঈয়ের সহিত হইয়া ছিল। মীরাবাঈ ছেলে বেলা হইতেই শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির সেবা অর্চ্চনা করিতেন। মীরাবাঈয়ের শ্রীকৃষ্ণের উপর এমন অনন্য ভক্তি ছিল যে তিনি নিজের পতি গৃহে গিয়া কাহার

কথা শুনিতেন না এবং নিজের কুলদেবতারও পূজা করিতেন না। এই কারণে রাণা তাহার উপর অপ্রসন্ন হইয়া তাহাকে ভূত গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। মীরাবাঈ যাহা কিছু ধন সম্পত্তি নিজের পিত্রালয় হইতে আনিয়াছিলেন, তাহার দ্বারায় তিনি ভূতমহলে গিরিধারী লাল জিউকে ডাকাইলেন। তিনি সকল সাধুমণ্ডলীকে প্রতিদিন ডাকাইয়া নৃত্য গীত উৎসব আদি করিতেন। এই কীর্ত্তির জন্য মীরাবাঈয়ের কুটুম্বেরা তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। আর রাণা অন্য বিবাহ করিলেন। মীরাবাই বাড়ী ছাড়িয়া বৃন্দাবনের তুলসী বনের ভিতর গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের পর তিনি গোকুলে গেলেন, পুনরায় চোরা দ্বারকায় গিয়া সাধুদের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে রাণা পুরোহিতকে ডাকিয়া মীরাবাঈকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতে বলিলেন। পুরোহিত দ্বারিকায় গিয়া রাণার মনের ভাব মীরাবাঈকে বলিলেন। আর বলিলেন যতক্ষণ তুমি না যাইবে আমি অন্ন জল গ্রহণ করিব না। সেই সময় মীরাবাঈ বিচলিত হইয়া শ্রীরণছোড় জিউর (শ্রীকৃষ্ণ জিউ) শরণাগত হইয়া গদগদ কণ্ঠে পায়ে নুপুর বাঁধিয়া হাতে করতালি লইয়া ঈশ্বরের ভক্তিতে লীন হইয়া সুন্দর পদ গাহিতে লাগিলেন। এখনও মেবার প্রদেশে রণছোড় জিউর সহিত মীরাবায়ের ও পূজা হয়।

সম্পূর্ণ।

বিষ্ণু চরণ।